৮.১৮ স্বর্ণ সিংহাসন – Bangla Library

৮.১৮ স্বর্ণ সিংহাসন – Bangla Library

স্বর্ণ সিংহাসন –১৩৮

রনজিৎ বর্মার রক্তাক্ত দেহ ভূতলে পড়ে রইল। ছোরাখানা রনজিৎ বর্মার বুক থেকে টেনে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে মেঝের কার্পেট খানা সিক্ত হয়ে উঠলো।

মায়াবতী বিস্ময় নিয়ে বললো–কে আপনি! আপনি না এলে ও আমার সর্বনাশ করতো…বলুন কে আপনি?

হেসে বললো বনহুর–যে আপনার স্বামীকে পঙ্গু আর অন্ধ করে দিয়েছে আমি সেই ব্যক্তি। আর আপনার কোন ভয় নেই। এ বাড়ি নিলামে উঠবেনা। আপনার এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে হবেনা।

কিন্তু আপনি কে?

আমাকে দেখে এবং আমি আপনার স্বামীর এতোবড় ক্ষতি করেছি জেনেও আমার পরিচয় সহজ ভাবে জানতে চাইছেন?

হাঁ, জানতে চাই...আপনি যেই হোন আমি বলবো-আপনি দেবতা। নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ ইজ্জৎ, সেই সম্পদ আপনি রক্ষা করেছেন। আমার স্বামীর কর্মের উপযুক্ত শাস্তি আপনি দিয়েছেন। আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি সত্য, কিন্তু আপনার উপর আমার কোন রাগ হয়নি।

এমন সময় রাজাসিংহ হাতড়াতে হাতড়াতে এ ঘরে প্রবেশ করে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

রানীমাতা স্বামীকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে বললো–ওগো আমাদের চরম শত্রু রনজিত্বর্মা নিপাত হয়েছে...আমাদের শত্রু সেই বাড়ি নিলামে ডেকে নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলো তারই চক্রান্তে আমরা আজ নিঃস্ব এই দেখো কে এসেছে...... ফিরে তাকাতেই দেখলো রাণীমাতা জমকালো পোশাক পরিহিত সে আর নেই, যে পথে এসেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেছে।

*

বনহুর তার বিশ্রামাগারে অর্ধ শায়িত অবস্থায় রিভলভারটা নাড়া-চাড়া করে দেখছিলো। তার সুন্দর মুখমন্ডলে একটা দুঃচিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। বসে থাকার বা বিশ্রাম করার মানুষ বনহুর নয়। আজ সে শান্ত মানুষটির মত শয্যায় অর্ধশায়ীত অবস্থায় কি যেন গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবছিলো।

এমন সময় নূরী এলো তার পাশে, একটু হেসে বললো–এতো কি ভাবছে দস্যুরাজ?

তোমাকে বলা যাবেনা।

কেন আমার কি অপরাধ?

বাধা হানবে আমার শুভ যাত্রায়।

শুভ যাত্রা!

হাঁ, শুভ যাত্রাই বটে……একটি চিঠি বের করে নূরীর হাতে দেয় বনহুর।

নূরী বলে-আমি কি পড়তে পারি। তুমিই পড়ো।

বনহুর নূরীর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগলো–

বনহুর, আমি কে বা আমার কি পরিচয় তুমি জানোনা তুমি আমাকে দেখোনি কোন দিন। আমি তোমাকে দেখেছি। তোমার পৌরুষদীপ্ত চেহারা আমাকে অভিভূত করেছিলো। আর সেই কারণেই আমি তোমাকে খুঁজেছিলাম, তোমাকে পেয়েওছিলাম কাছাকাছি কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ব তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়েছিল, সরে গিয়েছিলাম দূরে। কোন এক স্থানে। আমার আস্তানা। আস্তানায় ফিরেও মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পাইনি তোমাকে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছিলাম……..।

থাক আর শুনতে চাইনা। অমন কত নারীই না তোমাকে ভালবেসে জীবন। বিসর্জন দিয়েছে। নূরী মুখ খানা ফিরিয়ে নিলো।

বনহুর বললো—বসো নূরী শেষ অংশটা শুনবেনা।

না আমি আর শুনতে চাইনা। গম্ভীর কণ্ঠে বললো নূরী

। হেসে বললো বনহুর–মেয়েরা মিছামিছি একটুতেই অভিমান করে। অযথা অভিমান করা। আমি তো আর কাউকে ভাল বাসতে যাইনি। শোনই না সবটুকু।

পড়ো তবে ভালবাসার কথা আর শুনতে চাইনা।

বনহুর নূরীর হাত ধরে পাশে বসিয়ে দিয়ে বললো–বসো শোন, এরপর কি লিখেছে। চিঠিখানা পড়তে শুরু করে বনহুর।

কিন্তু আজ আমার প্রধান শত্রু তুমি, তোমার নাম শুনলে শরীরে আমার আগুন ধরে যায়। আমার বিশ্বস্ত অনুচর হামরাকে তুমি হত্যা করেছো বনহুর। হামরা ছিলো আমার প্রিয় অনুচর।

আনমনা হয়ে যায় বনহুর, আপন মনে বলে-হারা। হাঁ হামরা নামক একব্যক্তি-ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছিলাম.....

নূরী বললো–কে সে হামরা? কি করেছিলো সে?

হামরা নামক লোকটি জাহাজ উল্কার চালক হিসাবে কাজ করতো। আমরা জানতামনা হারা কোন চোরাকারবারীর সঙ্গে জড়িত ছিলো। বেশ কিছুদিন সে উল্কাতে নাবিক হিসাবে কাজ করে বিশ্বাস এনেছিলো আমাদের মনে। গোপনে আমারই জাহাজের খোলের মধ্যে সোনা ভরে পাচার করতো সে। না, আমি তাকে ক্ষমা করিনি, জানার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা কারে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলাম তার প্রাণহীন দেহ। সেদিন জানতামনা তার নাম হামরা, সে ছদ্ম নামে আমার এখানে নাবিক হিসাবে কাজ করতো...

কি নির্দয় তুমি!

অট্টহাসি হেসে বললো বনহুর–অন্যায় কারী যেই হোক তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া আমার কাজ।

তুমি তাতে জয়যুক্ত হতে পেরেছে হুর?

জয় যুক্ত হতে পারিনি তবে কিছু কিছু সফল কাম হয়েছি।

তুমি চিঠিখানা এবার শেষ করে ফেলো। বললো নূরী।

বনহুর চিঠিখানা ভাল ভাবে চোখের সম্মুখে মেলে ধরে বললো–কয়েক বার শেষ করেছি চিঠিখানা। তবে শোন...

হামরাকে আমিই পাঠিয়ে ছিলাম এবং সুকৌশলে সে তোমার উল্কায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। আমি যে খানে বাস করি সেখানে কেউ কোন দিন প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু মনে রেখো বনহুর তুমি হাম্রাকে হত্যা করে। রেহাই পাবেনা। আমার হাতে তোমার নিস্তার নাই, আমার অনুচর হাম্রাকে হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবো। আমার স্বর্ণ সিংহাসন তোমার রক্তে রঞ্জিত করবোই করবো।

—রানী হেমাঙ্গিনী

চিঠিখানা পড়া শেষ করে ভাজ করতে করতে বললো বনহুর রাজা মঙ্গলসিংহের বিধবা পত্নী হেমাঙ্গিনী এর আসল পরিচয়, রাজা মঙ্গলসিংহ হঠাৎ শিকারে গিয়ে নিখোঁজ হন, বহু সন্ধান করেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। মঙ্গল সিংহের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান রানা বিজয় সিংহের বয়স তখন কিছু কমছিলো, তাই সে পিতার সন্ধান ঠিক ভাবে করতে পারেনি। কয়েক বছর পর রানা বিজয় সিংহ পিতার নিরুদ্দেশ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করলো এবং সন্ধান করতে লাগলো। বিমাতা হেমাঙ্গিনী তাকে আদর দিয়ে বলেছিলো, তোমার বাবা মঙ্গল সিংহকে সিংহ ভক্ষণ করেছিলো। তাই তাকে আমরা খুঁজে পাইনি। তুমিও পাবেনা কোনদিন।

মা হারা বিজয় সিংহ পিতার নির্মম পরিণতির কথা ভেবে মুষড়ে পড়লো।

বিমাতা হেমাঙ্গিনী বিজয় সিংহের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলো, যে যাবার চলে গেছে তার জন্য দুঃখ করোনা বিজয়। আমি তো আছি, কোন চিন্তা করোনা। বিজয় সিংহকে মুখে সান্তনা দিলেও ভিতরে ভিতরে বিজয় সিংহকে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে চললো এই হেমাঙ্গিনী। রাজা মঙ্গল সিংহের মন্ত্রিবর অনাথ সেন, বুঝতে পারলো রাণী হেমাঙ্গিনীর মনের কথা। তার গোপন বাসনা আর কেউ না বুঝলেও বুঝলো সে, তাই অনাথ সেন, রাজা মঙ্গল সিংহের বংশ রক্ষার্থে সর্বক্ষণ পিতৃ মাতৃহারা বিজয় সিংহকে আগলে রাখলো। আর সে কারণেই বিজয় সিংহকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো রানী হেমাঙ্গিনীর।

নূরী বললো–রাক্ষসী রানী এই হেমাঙ্গিনী।

ঠিকই বলেছো নূরী। রাক্ষসীই বটে...

তুমি এতো সন্ধান জানলে কি করে হুর?

মৃদু হাসলো বনহুর।

বললো নূরী-জানি তোমার অজানা কিছু থাকেনা তবু ভাবছি হেমাঙ্গিনীর এতো খোঁজ তুমি পেলে কার কাছে?

মন্ত্রিবর অনাথ সেনের কাছে।

এ নামটা আমি শুনিনি কোনদিন। অনাথ সেন..

হাঁ, বৃদ্ধ অনাথ সেন, অনাথই বটে। নূরী অনাথ সেনের জীবন কাহিনী বিস্ময়কর বটে।

তার জীবন কাহিনীও তুমি জানো নাকি?

বললাম তো রাজা মঙ্গল সিংহের অনাথ মন্ত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে ছিলো আমার এবং তার মুখেই অনেক কথা জানতে পারি সেদিন।

আমারও বড় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে এই রাজা মঙ্গল সিংহের রাজ পরিবারের কাহিনী সত্যিই রহস্যময়।

হাঁ নূরী, রহস্যময়ই বটে।

বলবে হুর, আজ বহুদিন পর নিভৃতে পেয়েছি তোমাকে বলবো। মন্থনা থেকে ফিরে এসে কান্দাই প্রবেশ পথে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো আমার। তাও আশ্চর্য ভাবে।

কি রকম? বললো নূরী।

আমার কান্দাই শহরের আস্তানার প্রবেশ মুখে একটি কুকুর বসে বসে হাঁপাচ্ছিলো। আমি অশ্ব থেকে নামতেই কুকুরটা আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। দেখলাম তার গলার বেল্টে একটি কাগজের টুকরা।

আমি কুকুরটির মাথায় হাত বুলোতেই সে লেজ নেড়ে কিছু বলতে চাইলো, আমি বুঝলাম তার গলার বেল্টের কাগজ খানার কথাই সে বলতে চাইছে। আমি তার গলার বেল্ট থেকে কাগজের টুকরাটা খুলে নিয়ে পড়লাম, তাতে লিখা আছে

দস্যুসম্রাট আমার অভিবাদন গ্রহণ করো। আমি রাজা মঙ্গল সিংহের মন্ত্রি অনাথ সেন। একটা ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি। তুমি ছাড়া কেউ পারবেনা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। যদি সাক্ষাতের অনুমতি দাও তবে ধন্য হবো।

–অনাথ

চিঠিখানা পড়ে কুকুরকে বললাম-যাও নিয়ে এসো তাকে।

আর তুমি?

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু পর কুকুরের পিছনে পিছনে এলো এক বৃদ্ধ তার শরীরে ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্র হাতে লাঠি। আমার সম্মুখে এসে দু'হাত জড়ো করে প্রণাম করলো।

আমি তাকে এবং তার কুকুরটিকে সঙ্গে করে গোপন সুড়ঙ্গ পথ ধরে নিয়ে গেলাম ভূগর্ভ আস্তানায়। অনাথ সেন আসন গ্রহণ করলো, তার পাশে বসে পড়লো তার বিশ্বস্ত কুকুরটা, যেন সেও একজন অতিথি।

অনাথ সেনের মুখ মন্ডলে বিষণ্নতার ছাপ বিদ্যমান, ঘোলাটে চোখে একটা ভীত ভাব ফুটে উঠেছে যেন। এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো সে। আমি বললাম-বলুন যা বলতে চান?

অনাথ সেন বললো–আমি যা বলবো ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। আমি জানি তুমি মানুষের মঙ্গল চিন্তা করো আর সে জন্যই ঈশ্বর আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বলুন কি আপনার বিপদ? যদি আমার কিছু করণীয় থাকে করবো।

আমার কথায় কতকটা আশ্বস্ত হলো অনাথ সেন এবং বললো–বিপদ ঠিক আমার নয় রাজকুমার বিজয় সিংহের।

আমি অবাক হয়ে বললাম-নিজের কান্না না কেঁদে আপনি অপরের জন্য কাঁদতে এসেছেন?

বললো অনাথ সেন সত্যি দস্যু সম্রাট তুমি ঠিকই বলেছো। রাজ কুমার বিজয়সিংহ আমার কেউ নয়। তবে কেনো আমার মন তার জন্য কাঁদে। একটু থেমে চোখ দুটো হাতের পিঠে মুছে নিয়ে বললো পিতৃ মাতৃ হারা এই ছেলেটি আমার মতই অনাথ। আমার যেমন কেউ নেই, রাজকুমার বিজয় সিংহেরও কেউ নেই। রাজা মঙ্গল। সিংহের একমাত্র সন্তান বিজয় সিংহ। হিন্দল রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী বিজয় সিংহকে তারই বিমাতা রাণী হেমাঙ্গিনী এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

অনাথ সেন আবার থামলো তারপর নিজকে সামলে নিয়ে গলার স্বর স্বাভাবিক করে বলতে শুরু করলো-আমি যখনই বুঝতে পারলাম রাণী হেমাঙ্গিনী এই শিশু পুত্রটিকে হত্যার চেষ্টা করছে তখন থেকেই আমি তাকে নিজের কাছে কাছে রেখে সাবধানে তার উপরে খেয়াল রাখলাম। ইতি পূর্বে রাণী হেমাঙ্গিনী রাজা মঙ্গল সিংহকে শিকারে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে। শিকার থেকে ফিরে এসে হেমাঙ্গিনী ও তার সহকারীগণ প্রচার করেছিলো রাজা মঙ্গল সিং হিংস্র জন্তুর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু আসলে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। পরে আমি জানতে পারি রাণী হেমাঙ্গিনী, জলের সঙ্গে অজ্ঞানের ঔষধ মিশিয়ে রাজাকে খেতে দেয়। রাজা বিনা দ্বিধায় সেই জল পান করে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন হেমাঙ্গিনী তার প্রধান সহচর রথীন্দ্রকে অর্পণ করে রাজাকে কোন গোপনস্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে। রথীন্দ্র রাণী হেমাঙ্গিনীর নির্দেশ পালনে রাজা মঙ্গল সিংহকে সরিয়ে নিয়ে গেলো।

রাণী হেমাঙ্গিনী অন্যান্য অনুচর সহ ফিরে এলো হিন্দলে। রাজা মঙ্গল সিংহ শিকারে গিয়ে হিংস্র জন্তর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন এ কথা রাজ্যময় প্রচার হলো।

গোটা রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো। রাণী হেমাঙ্গিনী বিধবার ড্রেস পরিধান করে অন্তপুরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করলো সে। আমি নিজেও মর্মাহত হয়ে পড়লাম, রাজা মঙ্গল সিংহ আমাকে ভাল বাসতেন, বিশ্বাস করতেন। তার মৃত্যু আমার হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো। সেদিন বুঝিনি বা বুঝতে পারিনি রাণীর এ কান্না সত্যি কারের কান্না নয়, এটা তার অভিনয়। সুদীর্ঘ সময় কেটে গেলো। হেমাঙ্গিনী নিজে রাজ্য পরিচালনা করে চললো। তার খেয়াল খুশিমত কাজ করে চললো, প্রজাগণ রাণী হেমাঙ্গিনীর আচরণে সন্তুষ্ট হলো না। এমন কি সকলের সঙ্গেই রানী অসৎ আচরণ করে চললো, রাজ কর্মচারীদের সঙ্গেও তার বিরুপ মনোভাব প্রকাশ পেলো।

আমার বয়স হয়েছিলো তাই আমাকে কিছুটা সমীহ করে চলতো। অবশ্য কারণ ছিলো বিজয় সিংহের সমস্ত দায়িত্ব ভার আমিই গ্রহণ করেছিলাম, বিজয় সিংহকে রাণী কোন মুহূর্তে কাছে পেতোনা। তাই কিছুটা আমাকে ভয় করতো ভিতরে ভিতরে।

দিন যায়, কুমার বিজয় সিংহ এখন তরুন। তার বোঝার মত ক্ষমতা হয়েছে। অনেক কিছুই বোঝে সে, আর বোঝে বলেই আমি তাকে অনেক গোপন কথা বলেছি। তাই সে নিজের ব্যাপারে সজাগ। বনহুর আমি একদিন জানতে পারি

রাজা মঙ্গল সিংহকে হত্যা করা হলেও আসলে তাকে হত্যা করা হয়নি। তাকে কোন গোপন গুহায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। রথীন্দ্র সেদিন রাণী হেমাঙ্গিনীর নির্দেশ পালনে রাজাকে হত্যার জন্য অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেলেও হত্যা করতে পারেনি, তাকে সকলের অলক্ষে একটি পর্বতের গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছিলো। সুদীর্ঘ বারোটি বছর রাজা মঙ্গল সিংহ আটক আছে সেই গুহায়। আজ রথীন্দ্র বৃদ্ধ, সে রাজ দরবারে কাজ করে এবং গভীর রাতে সেই গুহায় প্রবেশ করে রাজা মঙ্গল সিংহকে যৎ সামান্য খাবার খাইয়ে দিয়ে আসে।

অনাথ সেন বলেই চলেছে-রাণী হেমাঙ্গিনী রথীন্দ্রর সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতো, তাই সে একদিন সব গোপন কথা আমার কাছে ব্যক্তি করলো। সেদিন আমি খুব খুশি হলাম, রথীন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম তুমি যে কাজ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। রাজা বাহাদুরকে তুমি হত্যা না করে জীবিত রেখে তাকে সুদীর্ঘ সময় খাদ্যদান করে রক্ষা করে এসেছো এটা মহা পূণ্যের কাজ করেছো ভাই। তখন রথীন্দ্রই আমাকে পরামর্শ দিলো, রাণী হেমাঙ্গিনী যদি জানতে পারে মহারাজ মঙ্গল সিংহকে আমি হত্যা না করে জীবিত রেখেছি তা হলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে হত্যা করবে এবং রাজাকেও সে জীবিত রাখবেনা। রথীন্দ্রকে আমি বলেছিলাম, তাহলে রাজা মঙ্গল সিংহ কি চিরদিনের জন্য সবার কাছে মৃতই থেকে যাবেন? রথীন্দ্র তখন আমাকে বলেছিলো, রাণী হেমাঙ্গিনী হিন্দলের রাজসিংহাসনের অধিকারিণী এবং তার একটি গুপ্ত গুহা আছে সেখানে তার শতাধিক সহকর্মী আছে যারা তার অপকর্মে সর্বক্ষণ সহায়তা করে চলেছে। তাদের সহযোগীতায় রাণী হেমাঙ্গিনী একটি স্বর্ণসিংহাসন তৈরি করছে যে স্বর্ণসিংহাসন পৃথিবীর কোন রাজা মহারাজা তৈরি করতে পারেনি। এ সব দেশে থেকে স্বর্ণ নিয়ে গিয়ে অন্যদেশ দেশান্তর থেকে খাঁটি স্বর্ণ নিয়ে এসে এই সিংহাসন তৈরি হচ্ছে। এই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দামী দামী কারিগর দ্বারা এই সিংহাসন তৈরি হচ্ছে। এই হেমাঙ্গিনীকে একমাত্র ব্যক্তি আছে সেই পারবে কাবু করতে সে হলো দস্যু বনহুর। তাই অনেক দিনের প্রচেষ্টার পর আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি এটা ঈশ্বরের দোয়া। রথীন্দ্র যদিও তোমার সন্ধান দিয়েছে কিন্তু পথ দেখিয়ে দিয়েছেন পরম করুণাময়। এই কুকুরই আমার পথ প্রদর্শক...কথাটা বলে অনাথ সেন কুকুরের মাথায় পিঠে সঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

নূরী স্বামীর মুখে এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনছিলো, এবার বললো–তুমি হেমাঙ্গিনীর এ চিঠি কোথায় পেলে?

সেই কুকুর, বুঝলে নূরী সেই কুকুর এই চিঠিখানা বহন করে এনেছে। তবে আমার শহরের আস্তানায় এ চিঠিখানা পৌঁছে দিয়েছে সে। চিঠিখানা হেমাঙ্গিনীর লিখা কিন্তু অনাথ সেনের কুকুর এ চিঠি নিয়ে এলো কেন? আমি এ চিঠি খানা এবং কুকুরটিকে নিয়ে ভাবছি।

নূরী বললো–হাঁ, রহস্যময় বটে। তবে কি অনাথ সেনের কোন দূরভিসন্ধি আছে এ সবের পিছনে?

বনহুর কি যেন গভীর মনযোগ সহকারে ভাবছিলো, নূরীর কথার কোন জবাব দিলোনা সে।

এ কুকুরটি তবে কার, রাণী হেমাঙ্গিনীর না অনাথ সেনের।

বনহুর বললো এবার-নূরী কুকুরটি যে অনাথ সেনের সঙ্গে আমার শহরের আস্তানায় এসেছিলো তা হেমাঙ্গিনী টের পেয়ে গেছে। অনাথ সেনকেও হয় হত্যা নয় বন্দী করে রেখে কুকুরটিকে হেমাঙ্গিনী ব্যবহার করেছে।

হাঁ, তোমার অনুমান সত্য হতে পারে। কুকুরটিকে তুমি ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছে।

না ভুল করিনি নূরী বরং তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি গোপনে তাকে অনুসরণ করে। পথের সন্ধান পেয়েছি। কুকুরটি সোজা সেই পর্বতের দিকে চলে গেলো, যেখানে রাণী হেমাঙ্গিনী তার দলবল নিয়ে একটি আড্ডাখানা বা আস্তানা তৈরি করে নিয়েছে। আমি আর এগুনি, কারণ আমি হেমাঙ্গিনীকে এ ভাবে জানাতে চাইনা যে সে জানুক আমি কুকুরটিকে ফলো করেছি হাঁ, পরে সব জানবে নূরী। তারপর আপন মনে বলে বনহুর–অনেক কিছু জানার এবং করার বাকি আছে। সেই পর্বতের কোন স্থানে রয়েছে হেমাঙ্গিনীর আস্তানা, কোন জায়গায় অনাথ সেনকে বন্দী বা নিহত অবস্থায় রাখা হয়েছে আর কোথায় বা বন্দী অবস্থায় আছেন রাজা মঙ্গল সিংহ। তারপর রাজা মঙ্গল সিংহের পুত্র বিজয় সিংহই বা কি অবস্থায় কেমন ভাবে আছে…

অবশ্য বনহুরের চিন্তা ধারা মিথ্যা নয়, বনহুরের আস্তানায় অনাথ সেন এসেছিল এবং তার সঙ্গে এসেছিলো অনাথ সেনের বিশস্ত কুকুরটি। এ কথা যখন জানতে পারে হেমাঙ্গিনী তখন অনাথ সেনকে বন্দী করে এবং তার উপর চালায়

নির্মম নির্যাতন। বুঝতে পারে হেমাঙ্গিনী অনাথ সেন গোপনে বনহুরের আস্তানায় গিয়ে হয়তো তার সবকথা ফাঁস করে দিয়েছে।

কুকুরটির মাথায় হাত বুলিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিলো হেমাঙ্গিনী-যা ভোলা এই চিঠি তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আয় যার কাছে তোর মনিব গিয়েছিলো। ভোলা বুঝতে পারে হেমাঙ্গিনীর কথা এবং সে পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল পেরিয়ে চলে এসেছিলো কান্দাই। এসে সে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিলো বনহুরের আস্তানায়। চিঠিখানা ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিলো বনহুরের হাতে। এটা হেমাঙ্গিনীর সেই চিঠি।

বনহুর হেমাঙ্গিনীর চিঠিখানা বার বার পড়ে বুঝতে পারলো-হেমাঙ্গিনী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে বনহুরের উপরে কারণ শুধু হারা হত্যা নয় এর পিছনে আছে আরও রহস্য……

এবার বনহুর রিভলভারটা হাতে তুলে নিলো এবং সেটা নাড়তে নাড়তে বললো–হেমাঙ্গিনীর স্বর্ণ সিংহাসনের স্বাদ গ্রহণে তাকে সহায়তা করবে এটা। তাই এই চিঠি আর এটার আমার প্রয়োজন।

বললো নূরী-তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না হুর?

এখন না বুঝলে পরে বুঝবে? এবার বলো নূরী তুমি কোনটি চাও? স্বর্ণ সিংহাসন না তোমার স্বামীকে?

আজও টুমি জানোনা কোনটা আমার কাছে মূল্যবান।

যে স্বর্ণ সিংহাসনের জন্য একটি নারী তার স্বামীকে হত্যা করেছে এবং অন্য একটি পুরুষের প্রেম ভালবাসা প্রার্থী হয়েছে। তুমি ও একজন নারী।

বুঝতে পারছি তুমি আমাকে স্বর্ণ সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে আমাকে যাচাই করতে চাও। আমি যদি তোমার সঙ্গিনী হয়ে থাকি তাহলে স্বর্ণ সিংহাসন না হয়ে হীরা মনি মুক্তা ঘটিত সিংহাসন হতো তবুও আমি আমার প্রিয়তমকেই ভালবাসবো, প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় তুমি হুর।

নূরী! গভীর আবেগে টেনে নিলো বনহুর তার কাছে।

ছিঃ ছেড়ে দাও, কেউ এসে পড়বে যে। ছাড়ো বলছি।

বনহুর বলে নুরী সত্যি তুমি বনফুল। গভীর জঙ্গলে থেকেও তোমার সৌন্দর্য এতোটুকু ম্লান হয়নি। যেখানেই থাকি তোমার মুখ খানা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এ সব আজ নতুন করে বলছো কেন হুর?

মনের কথা বলার অবসর কোথায় বলো? আজ তোমাকে বড় কাছে পেয়েছি, তাই...।

তাই মনের কথা ব্যক্ত করছো তুমি?

তুমি যে কত সুন্দর আগে তেমন করে বুঝবার সময় হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি বনফুল।

নূরী স্বামীর বুকে মাথা রাখে। অনাবিল আনন্দে ভরে উঠে তার হৃদয়।

*

অনাথ সেন আপনি বহুদিন আমাদের নিমক খেয়েছেন, নিমক হারামি করতে আপনার বাধলো না? আপনি ভোলাকে নিয়ে আমাদের চরম শত্রু দস্যু বনহুরের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তারই শাস্তি আপনার এই নির্মম অবস্থা। কথাগুলো রাণী হেমাঙ্গিনী দৃঢ় কণ্ঠে বললো।

অনাথ সেন কিছু বলতে গেলো কিন্তু পারলোনা। আজ কয়েক দিন তার মুখে খাবার পড়েনি এমন কি এক বিন্দু পানিও দেওয়া হয়নি তাকে। লৌহ শিকলে তার হাত এবং পা শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাকে একটি জমাট অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে হেমাঙ্গিনীর সহচরগণ এসে তাকে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে তোলে। বৃদ্ধ অনাথসেনের জীবন কাহিল হয়ে পড়েছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে আছে। মাথার চুল এলো মেলো তৈল বিহীন। হেমাঙ্গিনী, তার চুল গুলো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলছিলো কথা গুলো, অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ খানা বিকৃত করে বলে অনাথ সেন-আমাকে কষ্ট দিয়েও কোন ফল হবেনা। আমাকে হত্যা করো তবুও ফল হবেনা। তোমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি পাবেই, তোমার স্বর্ণ সিংহাসন ধূলায় লুণ্ঠিত হবে......

হেমাঙ্গিনী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–এভোবড় কথা বলতে পারলে অনাথ সেন! তোমার মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত হবে আর ক'দিন অপেক্ষা করো। শুধু তোমাকে নয়, তুমি সন্তান সম স্নেহ করো সেই তাকেও আমি তোমার মতই কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করবো। এই রাজ পরিবারে একমাত্র আমিই সম্রাজ্ঞী। যা বলবো তাই হবে……

অনাথ সেন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো-সবার উপরে একজন সম্রাট আছেন যার ইঙ্গিতে তুমি তৃণ কুটার মত উড়ে যাবে হেমাঙ্গিনী। রাজা মঙ্গল সিংহকে তুমি হত্যা করে হিন্দল রাজ্যের একচ্ছত্রি সম্রাজ্ঞী হয়েছো। কিন্তু পারবেনা নিজকে রক্ষা করতে।

এত কথা তোমার মনে আছে অনাথ সেন? কে বলেছে আমি রাজা মঙ্গল সিংহকে হত্যা করেছি। তাকে ব্যাঘ্র হত্যা করে ভক্ষণ করেছে আমি স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছি।

মিথ্যে কথা! এতো খানি মিথ্যা বলতে বাধলোনা তোমার….।

ভিখারী এত বড় সাহস তোমার।

হাঁ, আমি ভিখারীই বটে, এ কথা মিথ্যা নয়। পিতৃ মাতৃ হারা অনাথ একদিন এসেছিলো রাজ দরবারে। রাজা মঙ্গল সিংহর বাবা রাজা চন্দ্রনাথ সিংহ আমাকে করুণা দেখিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজ দরবারে। সেই দুয়ার কথা আমি ভুলিনি কোনদিন……

তবে নিমক হারামী করতে গেলে কেনো?

না, আমি নিমক হারামী করিনি, করবোনা কোনদিন, তবে আশ্রয়দাতার ক্ষতি সাধনও আমি করতে দেবোনা। জীবন দিয়েও আমি রক্ষা করবো রাজ বংশ।

তুমি তা পারবেনা অনাথ সেন কথা শেষ করেই হেমাঙ্গিনী তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে অনাথ সেনের বুক লক্ষ্য করে ধরলো তারপর বললো–তোমাকে হত্যা করার পূর্বে বিজয়কে হত্যা করার ইচ্ছা ছিলো। তুমি যেন দেখে যেতে পারো রাজ বংশ তুমি রক্ষা করতে পারলেনা কিন্তু তা হলো না। তোমার আর সময় নেই..

হেমাঙ্গিনীর কথা শেষ না হতেই তার হাত থেকে খসে পড়ে পিস্তল খানা। একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো হেমাঙ্গিনীর হাতের মুঠায়। যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো সে।

হেমাঙ্গিনী হাত খানা চেপে ধরে ফিরে তাকিয়েই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো– বনহুর তুমি!

হাঁ, আমি।

কে তোমাকে পথ দেখিয়ে এই স্থানে নিয়ে এলো?

অনাথ সেনের কুকুর ভোলা, যার দ্বারায় তুমি আমার কাছে চিঠি পাঠিয়ে ছিলে।

ওঃ ভোলা তাহলে বেঈমানী করেছো আমার সঙ্গে। হেমাঙ্গিনী উবু হয়ে তার হাত থেকে খসে পড়া পিস্তল খানা বাম হস্তে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই বনহুর পা দিয়ে পিস্তল খানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তারপর বললো–পারলেনা হেমাঙ্গিনী অনাথ সেনকে পরপারে পাঠাতে পারলেনা হিন্দল রাজ বংশকে নির্মূল করতে। অনাথ সেন কোন পাপ করেনি কাজেই তার প্রতি তোমার হিংসা কার্যকরি হবেনা।

বনহুর তুমি যতই তেজদ্বীপ্ত পুরুষ হওনা কেন এখানে একবার প্রবেশ করেছে আর বেরুবার পথ পাবেনা।

বলল বনহুর–তাই নাকি।

অনাথ সেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো, সে ভাবতেও পারেনি এ ভাবে ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে নেবেন। এবার বললো অনাথ সেন-দস্যু সম্রাট আপনি এই মুহূর্তে না এলে আমার মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিবো। আমাকে এই রাক্ষসীর কবল থেকে রক্ষা করুন দস্যু সম্রাট।

কেউ পারবেনা আমার কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করতে।

অট্টহাসি হাসলো বনহুর–তুমিই রক্ষা পাবেনা হেমাঙ্গিনী। তোমার অনুচরগণ আমার হাতে বন্দী এবং তুমিও!

না, আমি বিশ্বাস করিনা…

তোমার সহকারী এবং অনুচরগণকে বন্দী করতে আমার এতে বিলম্ব হলো, আর সেই সুযোগে তুমি অনাথ মুখ খানা বিকৃত করে ফেলছিলো।

বনহুর বললো–হেমাঙ্গিনী তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছিলে একদিন তুমি আমাকে ভালবেসে ছিলে তাই তোমার অপরাধ এ মুহর্তে ক্ষমা করে দিলাম, নইলে তোমাকে হত্যা করতে আমার কিছু মাত্র বেগ পেতে হতোনা। হাতে গুলি বিদ্ধ না করে তোমার শরীরে বিদ্ধহত আমার এই গুলিটি। যা হোক যে ভাবেই আমি এখনে এসেছি সেই ভাবেই আমি বেরিয়ে যেতে পারবো।

পারবে না বনহুর, আমার এই দুর্গম গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার কারো সাধ্য নাই..

বেরিয়ে যায় এই তো? এসো তোমার হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেই। কারণ যে ভাবে তোমার হাত থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তাতে তোমার জীবন হানিও ঘটতে পারে। তোমাকে এতো সহজে মরতে দিতে পারিনা কারণ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এতো সহজ নয়।

বনহুর হেমাঙ্গিনীর ওড়নাটা একটানে কেড়ে নিয়ে তার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলো ভাল করে। তারপর বললো–অনাথ সেনকে মুক্ত করে দাও হেমাঙ্গিনী কারণ সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

না, অনাথ সেনই সব নষ্টের মূল।

মিথ্যা কথা। হেমাঙ্গিনী তুমি জানোনা বিজয় সিংহকে হত্যা করেও তুমি হিন্দল রাজ বংশ সমূলে নির্মূল করতে পারবেনা। কারণ রাজা মঙ্গল সিংহ এখনও জীবিত…….

মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলো হেমাঙ্গিনীর মুখ মন্ডল, তারপরই হাসবার চেষ্টা করে বললো—আমাকে মিথ্যা ধোকা দিওনা বনহুর।

মিথ্যা নয় সত্য এবং যাকে তুমি তোমার স্বামীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো সে সেদিন রাজা মঙ্গল সিংহকে হত্যা না করে তাকে এক গোপন স্থানে

সরিয়ে রাখে এবং সেখানেই তাকে দিনান্তে এক মুঠি খাদ্য দিয়ে আসে....এই ভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে বেঁচে আছেন তোমার স্বামী।

আমি-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তোমার কথা বনহুর।

না পারলেও, বুঝতে কষ্ট হচ্ছেনা তোমার, কারণ তোমার স্বামী জীবিত। কাজেই বিজয় সিংহকে হত্যা করে কোনই ফল হবেনা তোমার, এ কথা তোমার জানা না থাকলেও আমি জানি।

আমি বিশ্বাস করি না।

রথীন্দ্রকে তুমি স্বামী হত্যার দায়িত্ব দাওনি বলতে চাও?

তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে চাইনা। হ্যাঁ, আমার স্বামী রাজা মঙ্গল সিংহ আমার যোগ্য স্বামী ছিলোনা তাই আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি।

তুমি মানবী দেবী না রাক্ষসী? স্বামীকে যে নারী হত্যা করে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়-সে নিশ্চয়ই রাক্ষসী...।

হ্যাঁ রাণী হেমাঙ্গিনী রাক্ষসীই বটে। তোমার রক্তে আমার স্বর্ণ সিংহাসন ধৌত করবো তারপর আমি তাকে উপবেশন করবো।

চমৎকার। সেদিন ধন্য হবে আমার রক্ত কণিকা। হেমাঙ্গিনী তোমার হাতের ব্যথাটা কি ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে?

ঠাট্টা করছে বনহুর। আমার দক্ষিণ হস্তে আঘাত করে তুমি ভাল করোনি। জানোতত আমাকে খাইয়ে দেবার কেউ নেই। সবাই আমাকে ভয় করে কিন্তু ভালবাসার আভাস কারো মধ্যে নেই। অনাথ সেন বড় নিমক হারামী, রথীন্দ্র বিশ্বাস ঘাতক, বিজয় সিংহ বিমাতা বলে ঘৃণার চোখে দেখে, জানিনা আমার অনুচরগণ আমাকে কেমন চোখে দেখে। বনহুর ভালবাসা আমি পাইনি কারো কাছে, যদি আমার জীবন কাহিনী শুনতে তাহলে তোমার লৌহ হৃদয় গলে যেতে বরফ গলা নদীর মত।

হেমাঙ্গিনী কথা বলছিলো পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে। দক্ষিণ হস্ত খানাকে ধরে রেখেছিলো বাম হস্তে শক্ত করে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রণায় মুখ খানা

তার করুণ হয়ে উঠছিলো, হয় তো পিস্তল খানা নাগালের মধ্যে পেলে বনহুরকে লক্ষ্য করে বাম হস্তেই গুলি ছুঁড়তো কিন্তু উপায় হীনা সে। তা ছাড়া বনহুরের কোমরের বেল্টে জমকালো রিভলভার রক্ষিত আছে, যার গুলিতে হেমাঙ্গিনীর দক্ষিণ হস্ত অকেজো হয়েছে।

বনহুর গুহার মেঝেতে একটি বড় পাথরে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনীর কথা শুনছিলো।

অনাথ সেন ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত তার চোখ দুটো ঘোলাটে দেখা যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব নিজকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে সজাগভাবে শুনছে হেমাঙ্গিনী আর বনহুরের কথাগুলো।

বললো বনহুর–অনাথ সেন যখন এ যাত্রা বেঁচেই গেলো তাকে জীবিত রাখার চেষ্টা করতে হবে। পাশের গুহায় পাথরের টেবিলে প্রচুর খাদ্য পানিয় দেখলাম থরে থরে সাজানো, নিশ্চয়ই তোমার জন্য ওগুলো প্রহর গুণছে। আমি ওখান থেকে কিছু খাবার অনাথ সেনকে এনে দিতে পারি যদিও সে আমার আপনজন বা বন্ধু নয়। তবে যদি তুমি অনুমতি করো? আমি জানি তুমি অমত করবেনা হেমাঙ্গিনী।

কথা গুলো বলে বনহুর হেমাঙ্গিনীর হাত থেকে খসে পড়া পিস্তল খানা তুলে নিয়ে পাশের গুহায় চলে গেলো এবং একটু পরেই ফিরে এলো থালায় কিছু খাবার আর এক গেলাস পানি নিয়ে।

এবার বনহুর নিজের হাতে অনাথ সেনকে খাবার খাওয়াতে লাগলো। খাওয়ানো শেষ হলে পানি পান করালো বনহুর স্বহস্তে তারপর বললো–হেমাঙ্গিনী চাবির গোছা দাও। আমি জানি চাবির গোছা তোমার কাছে আছে। দাও……হাত পাতলো বনহুর হেমাঙ্গিনীর দিকে।

হেমাঙ্গিনী নির্বাক দৃষ্টি মেলে বনহুরকে লক্ষ্য করছিলো, দস্যু হলেও তার মধ্যে আছে একটি মহৎ হৃদয় কিন্তু ওকে নিয়ে ভাবার সময় এখন নয়। বনহুর তার শত্রু…বললো হেমাঙ্গিনী চাবি আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি দেবোনা। কারণ অনাথ সেন তোমাকে এখানে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। নইলে কোনদিন তুমি এখানে আসতে পারতে না।

অনাথ সেন যদি ভুল করে থাকে তবে আমি তার হয়ে ক্ষমা চাচ্ছি কারণ.....

কারণ শুনতে চাইনা বনহুর! এই নাও চাবী খুলে দাও ওর হাত পা এর বাধন। কিন্তু মনে রেখো এর পর যদি সে আমার পিছনে কোন মতলব আটে তা হলে রক্ষা পাবেনা।

হাসলো বনহুর, তারপর বললো–তুমি আর সে সুযোগ পাবেনা হেমাঙ্গিনী। আমি তোমাকে বন্দী করেছি, তোমার সাহায্য কারীরা কেউ জীবিত নেই।

না, তারা দুঃসাহসী.......

কিন্তু আমি তাদের সবাইকে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছি। হাঁ, দুঃখ যে আমার হয়নি তা নয়। তোমার নির্মম কাজে তোমাকে সাহায্য করার জন্যই তাদের এই পরিণতি। আমি সুস্থ শান্ত মস্তিষ্কে এদের হত্যা করেছি। এদের লাশ তোমার তৃতীয় গুহায় স্তূপ করে রেখে তোমার সন্ধানে এসেছি। আমার আগ্নেয় অস্ত্রের শ শুনতে পাওনি কারণ আমার অস্ত্রটি ছিলো শব্দ বিহীন।

বনহুর এ কাজটা তুমি ভাল করেনি। তোমার আচরণে খুশি হবো ভেবেছিলাম কিন্তু সব তুমি বিনষ্ট করে দিলে। হৃদয়হীন তুমি এই মুহূর্তে আমি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম, হারাকে হত্যা করে তুমি আমার শত্রু হয়েছো না না তোমাকে আমি জীবিত রাখতে পারিনা। অধর দংশন করে হেমাঙ্গিনী।

ততক্ষণে বনহুর অনাথ সেনকে মুক্ত করে দিয়েছে।

বলে বনহুর–অনাথ সেন আপনি এবার যেতে পারেন। আপনার পথ মুক্ত, রাণী হেমাঙ্গিনী বা তার কোন অনুচর আপনার পথ রোধ করতে পারবে না।

অনাথ সেন হাত তুলে বললো–দস্যু সম্রাট আপনার চির মঙ্গল হোক।

হেমাঙ্গিনী বললো–বনহুর সবাইকে হত্যা করলেও আমাকে তুমি বন্দী করতে পারোনি-বা পারবে না।

বনহুর দৃঢ় গলায় বললো–কোন নারীর প্রতি আমার কোন নির্মম আচরণ করার ইচ্ছা নেই, সে কারণেই আমি তোমার উপর কঠিন আচরণ করিনি। তবে তুমি যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তা হলে আমি বাধ্য হবো......

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো হেমাঙ্গিনী। বনহুর আমি তোমার আচরণে মুগ্ধ বটে, তবে তোমার করুণার পাত্রী আমি নই। হামরাকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে আমার সঙ্গী সাথীদেরকে। আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি যা বলি বা মনে করি তা আমি করবোই। আমার স্বর্ণ সিংহাসন আমি তোমার রক্তে রঞ্জিত করবোই এটা কেউ রোধ করতে পারবেনা।

আমার রক্তে তোমার স্বর্ণ সিংহাসন রঞ্জিত করবে সে তত বড় সুন্দর কথা। কিন্তু এক শর্তে আমি তোমাকে রক্ত দেবো সেটা হলো রাজা মঙ্গল সিংহকে তুমি আর হত্যার চেষ্টা করবেনা এবং রাজ কুমার বিজয় সিংহকে তুমি মুক্তি দেবে। এবার বলল হেমাঙ্গিনী আমার কথায় তুমি রাজি।

আনমনা হয়ে গেলো হেমাঙ্গিনী, মুখ মন্ডল ক্রমান্বয়ে ক্রোধান্ত হয়ে উঠলো। এবার বললো সে হিন্দলের একমাত্র সম্রাজ্ঞী আমি সবাই জানে মহারাজের মৃত্যু হয়েছে, এখন তাকে জীবিত বলে আমি স্বীকার করতে পারিনা বনহুর। রথীন্দ্রকে আমি হত্যা করবোই কারণ সে আমাকে ধোকা দিয়েছে। না, তাকে আমি ক্ষমা করবোনা......

বললো বনহুর–আমি বুঝতে পারছি রথীন্দ্র তোমার আদেশ পালন করেনি।

হাঁ, সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড....

কিন্তু যে আদেশ তুমি তাকে দিয়েছিলে, তার জন্য তুমিও অপরাধী এবং তোমার দন্ড মৃত্যু।

বনহুর রাজা মঙ্গল সিংহ আমার যোগ্য স্বামী ছিলো না। তার মধ্যে ছিলোনা কোন প্রেম ভালবাসা একটা নারী কি চায় সে তা বুঝতোনা। পূর্বস্ত্রীর স্মৃতি মন্থন করে সে বেঁচেছিলো বা আছে। তাই তাকে আমি সহ্য করতে পারিনি কোন দিন। বনহুর আমার জীবন কাহিনী শুনলে তুমি বুঝবে, কেন আমি এত নির্মম হয়েছি।

বললো বনহুর–অনাথ সেনকে মুক্ত করে বিদায় দিয়েছি এখন বলতে পারো তোমার জীবন কাহিনী, তবে শুনে বা বলে কোন ফল হবে কি?

হয়তো আমার বলেও কোন ফল হবে না, আর তোমার শুনেও কোন লাভ হবেনা, তবু আমার স্বস্তি আসবে বা শান্তি পাবো। বুকটা আমার হাল্কা হবে অনেক খানি। কোনদিন কাউকে যা বলতে পারিনি তোমাকে বলবো বনহুর।

বেশ বলো? বনহুর পাশে পড়ে থাকা পাথরটার উপরে বসে পড়লো।

হেমাঙ্গিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তবুও বলছে সে–আমি রাজ কন্যা নই আমার বাবা একজন জ্যোতিষি ছিলেন। তিনি শিশুকালে আমার হস্তরেখা দেখে বলেছিলেন আমি নাকি রাজরাণী হবো। বাবা মরে গেলেন একদিন সর্পদংশনে, তিনি পূর্ব থেকেই জানতেন তার মৃত্যু সর্পদংশনে হবে, তাই তিনি সর্বক্ষণ সাবধানে চলাফেরা করতেন। তবুও তাকে সর্পদংশনে প্রাণ দিতে হলো।

. কি ভাবে তাকে সর্পদংশন করলো? বললো বনহুর।

সে এক অদ্ভুত ঘটনা। বাবা ঘুমিয়ে ছিলেন আমি মাঝখানে মাও পাশে। হঠাৎ বাবার খুব গরম বোধ হওয়ায় তিনি বিছানা থেকে নেমে উঠানে এসে বসলেন। এমন সময় তার পায়ে কি যেন কামড়ে দিলো, বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। মা ও আমার ঘুম ভেঙে গেলো, মা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন একটি সর্পরাজ ধীরে ধীরে উঠানের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। বাবা পা ধরে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। ওঝা এল অনেক ঝাড় ফুক দিলো কিন্তু কোন লাভ হলোনা। বাবা মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর জীবন দুর্বিসহ এক মুঠি অন্নের জন্য মা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেড়াতে লাগলেন-একটু থেমে আবার বলতে লাগলো হেমাঙ্গিনী বনহুর তুমি আমার পরম শত্রু জেনেও তোমার কাছে আমার জীবন কাহিনী বিনা দিধায় ব্যক্ত করছি কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি বনহুর।

বনহুর নত মুখে শুনছিলো হেমাঙ্গিনীর কথা গুলো এবার সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো হেমাঙ্গিনীকে।

হেমাঙ্গিনী বলে চললো-দিন দিন আমি বড় হতে লাগলাম। মাঝে মাঝে মা বলতেন, হায় হতভাগিনী,তোর বাবা বলেছিলেন তুই নাকি রাজরাণী হবি। সব মিথ্যা সব মিথ্যা যার কপালে এক মুঠি অন্ন জোটেনা সে হবে রাজরাণী। দু'দিন পর আমি মরলে তোকে যে ভিক্ষে করতে হবে হেমা। মা বাবা আমাকে হেমা বলে ডাকতেন। সত্যি একদিন মাও চির বিদায় নিলেন, মন আমার বিদ্রোহ হয়ে উঠলো, আমি ভিক্ষে করবোনা। বাবা বলেছিলেন, রাজরাণী হবে। তাই একদিন কিছু ফুল নিয়ে রাজবাড়ীতে গেলাম। রাজা মঙ্গল সিংহের সবে পত্নী বিয়োগ হয়েছে ছোট্ট শিশু বিজয় তখন হামাগুড়ি দেয়। আমি ফুল নিয়ে যেতেই প্রহরী আমাকে বাধা দিলো। মহারাজ সিংহাসনে বসেই আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি

প্রহরীকে বললেন, আসতে দাও। দারোয়ান আমাকে ছেড়ে দিল। আমি মহারাজের কাছে গেলাম। রাজা মঙ্গল সিংহ আমার নিকট হতে একটি পুষ্প মাল্য কিনে নিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি দিতে হবে। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললাম, আপনার মাথার ঐ রাজ মুকুট। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকালো আমার মুখের দিকে কারণ তারা কোন দিন এমন দাবি শোনেনি কারো মুখে। বিস্ময় নিয়ে সবাই যখন তাকিয়ে আছে। রাজাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন রাজা নিজের মাথা থেকে রাজ মুকুট খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন।

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ী করলো।

একজন বললো–মহারাজ আপনি একি করলেন।

রাজা মঙ্গল সিংহ বললেন-পুষ্প মাল্যের কোন মূল্য হয়না, তাই ও যা চেয়েছে তাই দিলাম। যাও সারথীকে বলো ওকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে। হাঁ, আমাকে সেদিন মহারাজ মঙ্গল সিংহ তার মূল্যবান ঘোড়ার গাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

বনহুরও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিলো হেমাঙ্গিনীর দিকে।

হেমাঙ্গিনী বলছে-বাড়ি এসে ঘুমাতে পারলাম না। রাজ মুকুট দেখার জন্য শত শত লোক নারী পুরুষ ভীড় জমাতে লাগলো আমাদের বাড়িতে। সেদিন ভাবিনী এ রাজ মুকুট আমাকে রাজরাণীর আসনে বসাবে। রাজা মঙ্গল সিংহ একদিন আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এলো রাজবাড়ীতে রানীর আসনে স্থান দিলেন

একটু থামলো হমাঙ্গিনী তারপর আবার বলতে শুরু করলো কিন্তু আমি সুখী হতে পারলাম না। বাসর ঘরে রাজা মঙ্গল সিংহ তার ঘুমন্ত শিশু বিজয়কে বুকে জড়িয়ে খুব কাদলেন। আমার ভাল লাগলো না, বুঝতে পারলাম মহারাজ তার প্রথম স্ত্রীকে স্মরণ করে কাঁদছে। মন আমার বিষিয়ে উঠলো, মহারাজের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আসলো। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলাম, দেখলাম মহারাজ তার ঘুমন্ত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ঘুমাচ্ছেন।

ক্রমান্বয়ে দিন কাটতে লাগলো, স্বামীর সান্নিধ্য পেলাম কিন্তু তার প্রেম ভালবাসা পেলাম না কোনদিন। নীরস জীবন কাটতে লাগলো আমার। অর্থ ধন রত্ন মনি মানিক্যর অভাব ছিলো না। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো, তখন

পূর্বের অবস্থা স্মরণ করতাম। ভিখারীর মেয়ে হয়ে রাজরাণী হয়েছি এই তো অনেক বেশি, নাইবা পেলাম স্বামীর প্রেম প্রীতি ভালবাসা। কিন্তু নিজের মনকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারলামনা। নারীর কাম্য স্বামীর ভালবাসা, যার তুলনা হয়না ধন রত্ন মনি মানিক্যের সঙ্গে...দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো, সব সময় মন চাইতো রাজাকে সরিয়ে কি তবে নিজে রাজসিংহাসনের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হবো।

তারপর যা তুমি শুনেছো বনহুর তা সত্য।

রাজাকে হত্যা করেও তুমি তৃপ্ত হওনি, তুমি বিজয় সিংহকে হত্যা করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

হাঁ, কারণ বিজয় সিংহ একদিন আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তাকে আমি.......

হেমাঙ্গিনী এসব করে কি তুমি তৃপ্ত হবে মনে করেছে?

হবো, কারণ আমি যা পাইনি তা হয়তো আর পাবোনা। পাবো রাজসিংহাসনের একচ্ছত্রি সম্রাজ্ঞী হবার সৌভাগ্য। পাবো অগণিত প্রজাদের শ্রদ্ধা......

হাসলো বনহুর–মিথ্যা দুরাশা হেমাঙ্গিনী! প্রজাদের শ্রদ্ধা তুমি কোন দিন পাবেনা কারণ তোমার কার্যকলাপ জঘন্য তা কারো জানার বাকি নেই। যারা হয়তো জানেনা তারাও জানবে একদিন।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি যাতে তৃপ্তি হবো সেটাই আমি চাই। বনহুর ধন রত্ন লুটে নেওয়া যায়, কিন্তু প্রেম ভালবাসা লুটে নেওয়া যায় না। তাই আমি বড় অসহায়, মা জীবিত থাকলে হয়তো আমাকে কোন ভিখারী যুবকের সংগে বিয়ে দিতে। সেখানে থাকতোনা মনি মানিক, থাকতোনা রাজ প্রাসাদ। পেতাম স্বামীর ভালবাসা, প্রেম পূর্ণ প্রীতির সোহাগ। হেমাঙ্গিনীর গন্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।

বনহুর নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে। হেমাঙ্গিনীর ব্যথা উপলব্ধি করে অন্তর দিয়ে। সে বুঝতে পারে কেন হেমাঙ্গিনীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্ধ মানসী অমানুষীর রূপ নিয়েছে।

বলে হেমাঙ্গিনী-আজ আমার বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, সেই অগ্নিশিখার বিস্ফোরণ ঘটেছে বনহুর, তাই আমি হয়ে উঠেছি উন্মাদিনী, রাক্ষসী, যা খুশি বলো তাই। একটু থেমে হেমাঙ্গিনী বললো–বনহুর আমার সাধনা সার্থক হয়নি বলেই আমি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী হিসাবে। আমার থাকবে রাজ্য, অগণিত প্রজা, আমার থাকবে স্বর্ণ সিংহাসন, এ আমার স্বপ্ন।

হেমাঙ্গিনীর চোখে মুখে ফুটে উঠে একটি আত্নহারার ভাব। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য, পরমুহূর্তে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে হেমাঙ্গিনী বলে উঠলো–সে রাজা মঙ্গল সিংহ জীবিত আছে, রথীন্দ্র তাকে হত্যা না করে আমাকে মিথ্যা প্রতারণা করেছে। রথীন্দ্রকে আমি দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলাম। ভাবিনি সে আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে। ওকে আমি হত্যা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাবো না।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো–না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না কারণ তারই জন্য রাজা মঙ্গলসিংহ জীবনে বেঁচে আছে। বিজয় সিংহ জানেনা তুমি তাকে বা তার পিতাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলে। আমি রথীন্দ্রর ব্যাপারে জানি সে মহারাজকে তোমার সম্বন্ধে কোন কথাই বলে নাই। কাজেই তুমি যেমন পূর্বে রাণী ছিলে তেমনি থাকবে।

না না আমি চাই না আর রাজরাণী হতে আমি আমার স্বর্ণ সিংহাসন নিয়ে সুখী হতে চাই। কিন্তু মনে রেখো বনহুর তোমাকে আমি হত্যা করবোই এবং আমার স্বর্ণসিংহাসন তোমার রক্তে রঞ্জীত করবোই।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর, বলে- তুমি এখন বন্দী আমার কাছে। বরং এসো দু'জন মিলে রাজা মঙ্গল সিংহকে বন্দীখানা থেকে উদ্ধার করে আনি। রথীন্দ্রকেও মুক্তি দাও, তোমার ক্ষমার গুণে সে কোন দিনই তোমার ক্ষতি সাধন করবেনা।

বনহুর তুমি ওদের হয়ে খুব কথা বলছে-আমি তোমাকেও ক্ষমা করবোনা।

আমাকে ক্ষমা নাইবা করলে। তুমি নিজের কথা ভাবো হেমাঙ্গিনী। তোমার একটি অনুচরকে আমি জীবিত রাখিনি। কারণ, তারা রাজা মঙ্গল সিংহকে হত্যার চেষ্টায় সহায়তা করায় সবাইকে আমি হত্যা করেছি। কেউ তোমাকে সহায়তা করতে আর এগিয়ে আসবেনা। চলো আমার সঙ্গে....

তুমি আমাকেও হত্যা করতে চাও বনহুর?

নারী হত্যা আমি করিনি কারণ তারা...যাক শেষ কথা নাইবা শুনলে। হাঁ, তোমাকে হত্যা করা আমার কাছে অতি নগণ্য কাজ বরং তোমাকে যদি মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে পারি সেটাই হবে আমার সার্থকতা।

একটু থেমে বললো বনহুর। এসো আমার সংগে।

কোথায় যাবো? বললো হেমাঙ্গিনী।

বলেছি তো তোমাকে হত্যা করবো না। তুমি এ মুহূর্তে অসহায়। এসো-বনহুর হেমাঙ্গিনী পথ থেকে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর আর হেমাঙ্গিনী যখন গুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো তখন বাইরে একটি ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলো।

বনহুর বললো–উঠে পড়ো। ও তুমি একা উঠতে পারবে না, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বনহুর নিজেও চেপে বসলো। কোচওয়ান গাড়ি ছাড়লো।

এবড়ো থেবড়ো পথ, ঘোড়ার গাড়িটা চলছে।

বনহুর বললো–তোমার কষ্ট হচ্ছে হেমাঙ্গিনী?

না।

রাগ করোনা আমি নিরুপায় হয়ে তোমার হাতে গুলি ছুঁড়েছি।

তাতে আমার তেমন কিছু যায় আসেনা। বললো হেমাঙ্গিনী।

তোমার হাতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এটা অস্বীকার করতে পারোনা। তবে গুলিবিদ্ধ হয়নি, হাতের কিছু অংশ মাংস কেটে গেছে। তোমার হাতের কোন ক্ষতি হবে না হেমাঙ্গিনী। আমি এখন তোমাকে আমার একটি বজরায় নিয়ে যাচ্ছি।

বজরা...

হাঁ, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি কোন অসহায় নারীর প্রতি কোন জুলুম করিনা। সেটা আমার নেশা নয়।

জানি।

ঐ তো সমুদ্রতীর এসে গেছে।

হাঁ দেখতে পাচ্ছি। তবে তোমার উদ্দেশ্য এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না হেমাঙ্গিনী।

ঘোড়া গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে, পথ ততটা এবড়ো থেবড়ো নয়। তাই ঝাঁকুনিও কম। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো তাদের।

সমুদ্রতীরে এসে ঘোড়াগাড়িটা থেমে পড়লো।

অদূরে সমুদ্রতীরে একটি বজরা অপেক্ষা করছে।

বনহুর বললো–এসো হেমাঙ্গিনী। বাম হস্তে আমার হাত ধরে নেমে পরো।

হেমাঙ্গিনীর মনে নানা প্রশ্ন জাগছিলো, বনহুরকে সে এতো কাছাকাছি দেখেনাই, আজ হেমাঙ্গিনীর স্বপ্ন যেন স্বার্থক। বনহুরের প্রতি তার চরম রাগ থাকলেও সে রাগ ও ক্রুদ্ধ ভাব সব যেন উবে গেছে। যে বনহুরকে মনে প্রাণে কামনা করতো, যার সান্নিধ্য পাবার জন্য উনাখ ছিলো একদিন হেমাঙ্গিনী, সেই বনহুর আজ তার কত কাছে। মুহূর্তের জন্য হেমাঙ্গিনী তার গুলিবিদ্ধ হাতের যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়।

বনহুর বললো–কি ভাবছো?

না কিছু না।

চলো।

অদূরে সমুদ্রে বজরা।

বনহুর আর হেমাঙ্গিনী বজরায় উঠে পড়লো।

সুন্দর সুসজ্জিত বজরার কক্ষগুলি।

বনহুরকে দেখবা মাত্র বজরার মাঝি বেশী বনহুরের অনুচরগণ কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো–রনজিৎ তুমি সব প্রস্তুত করেছো?

করেছি সর্দার। বললো রনজিৎ।

বলিষ্ঠ জোয়ান রনজিতের মাথায় ঝাকড়া চুল। দু'কানে দুটি বালা। গোফগুলো মোচড়ানো এবং মোটা। তাকে দেখলে মনে হয় রাজ বংশীয়। অবশ্য এ কথা সত্য, রনজিতের জীবন কাহিনী বড় করুণ। শিশু বেলায় ওর মা বাবাকে হত্যা করে রনজিতকে ধরে নিয়ে আসে কোন এক ডাকাত দল। সেখানে সে মানুষ হতে থাকে। প্রতিদিন তাকে শুধু মাংস আর রুটি খেতে দেওয়া হতো। কোন কোন দিন শুধু মাংস দেওয়া হতো এবং তাকে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটা ঘোড়ায় চড়া এসব শিক্ষা দেওয়া হতো। কিছুটা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাকাত দল সঙ্গে নিয়ে যেতো এবং কি ভাবে লুটতরাজ রাহাজানি করে এসব শিক্ষা দেওয়া হতো। তারপর শুরু হলো একা একা ডাকাতি রাহাজানি করা। দলবল সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে চলে যেতো। ডাকাতি করে যে বেশি মালামাল আনতে তাকে পেট পুরে খেতে দেওয়া হতো। রনজিত ছিলো সৎ ব্যক্তি, সে অসহায়দের মালামাল লুণ্ঠণ করতো না, তাই তার মালামাল কম থাকতো। ডাকাতের সর্দার এ কারণে তাকে খাবার যৎ সামান্য দিতে এবং মাঝে মধ্যে প্রহার করতো।

একদিন রনজিত ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো। সর্দারের আচরণ সে মোটেই সহ্য করতে পারলো না, সে সর্দারকে কিছু না বলেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। তরুণ রনজিত আর ফিরে এলো না।

এক মাস দু'মাস কেটে গেলো।

রনজিত এক হোটেনে নিয়ে সেখানে থেকে গেলো। কান্দাই শহরের বড় হোটেল। সেখানে একদিন রহমানের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো। রনজিতের স্বাস্থ্য এবং

আচরণ ভাল লাগলো। রহমান কথায় কথায় জানতে পারলো তার জীবন কাহিনী। রহমানও তার সর্দার বনহুরের সম্বন্ধে বলেছিলো সেদিন।

কেন যেন খুব ভাল লেগেছিলো রনজিতের কাছে তার সর্দারের কথাগুলো। এর পর প্রায়ই, রহমান ঐ হোটেলে যেতো এবং রনজিতের সংগে আলাপ আলোচনা করতো।

রহমানেরও ভাল লেগেছিলো রনজিতকে তাই একদিন রহমান সর্দার বনহুরের অনুমতি নিয়ে রনজিতকে, হাজির করেছিলো বনহুরের সম্মুখে।

কেন যেন রনজিতকে বনহুরেরও খুব পছন্দ হয়।

বনহুরকেও রনজিতের ভাল লাগলো সেদিন! তখন সে হোটেলের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এলো এবং বনহুরের অনুচর হিসেবে শপথ গ্রহণ করলো।

সেই থেকে রনজিত বনহুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে কাজ করে আসছে। শুধু রনজিত নয় রাজা সিংহও বনহুরের একজন প্রিয় অনুচর। দুঃসাহসী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজা সিংহ। এরা হিন্দুধর্মী হলেও বনহুরকে তারা অতিব শ্রদ্ধা করে।

হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে বনহুর যখন বজরায় এসে পৌঁছলো তখন রনজিত এবং রাজাসিংহ ছিলো সেই বজরায়। তাদের পূর্ব হতেই সব কিছু নির্দেশ দেওয়া ছিলো।

বনহুর আদেশ করলো, নিয়ে যাও রনজিত রানীমাতাকে তার কামরায় পৌঁছে দাও।

রনজিত মাথা কাৎ করে বললো–আচ্ছা সর্দার।

বনহুর এবার হেমাঙ্গিনীকে বললো–যাও রানীজী তুমি ওর সঙ্গে যাও।

হেমাঙ্গিনী বললো–বনহুর তোমার উদ্দেশ্য কি? আমাকে এদের হাতে তুলে দিয়ে কোথায় পালাবে? মনে রেখো আমার প্রতি তুমি কোন অসৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে চাইলেও পরিত্রাণ পাবে না।

হাসলো বনহুর, হেসে বললো–নারীজাতির প্রতি আমার কোন প্রতিহিংসা নাই। বরং আমি তোমার মঙ্গল কামনা করছি। তুমি তোমার বিশ্রাম কামরায় বিশ্রাম করো। আমি পালাবো না।

হেমাঙ্গিনীকে পাশের কামরায় পৌঁছে দিলো রনজিত।

একটু পরেই জল খাবার এলো, হেমাঙ্গিনী হাতের ব্যথায় যদিও কাতর ছিলো তবুও ক্ষুধার জ্বালা কম ছিলোনা। তাই হেমাঙ্গিনী জল খাবার কিছুটা খেলো।

খাবার পর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো হেমাঙ্গিনী।

বনহুর বজরার বাইরে জায়নামাজ বিছিয়ে এশার নামাজ শেষ করে নিলো। শত ব্যস্ততার মধ্যেও বনহুর নামাজ কাজা করতোনা। আল্লাহই ছিলো তার সহায়।

ঘুম যখন ভাঙলো দেখলো তীরে ভীড়েছে তাদের বজরা।

হেমাঙ্গিনী চোখ মেলে বুজরার জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরের দিকে। এমন সময় বনহুরের কণ্ঠস্বর-তোমার গন্তব্যস্থানে এসে গেছে হেমাঙ্গিনী এবার তোমাকে নামতে হবে।

কোন স্থান আমার গন্তব্যস্থান?

হিন্দল রাজ্যের রাজপ্রাসাদ তোমার গন্তব্যস্থান। যেখানে তোমার অপেক্ষায় রাজা মঙ্গল সিংহ, পুত্র বিজয় সিংহ এবং আরও অনেকে প্রতিক্ষা করছে। হেমাঙ্গিনী তোমার স্বর্ণ সিংহাসনও রয়েছে সেখানে।

বনহুর এ সব তুমি কি বলছো?

হাঁ, সব সত্য। যে রাজাকে তুমি হত্যা করেছিলে সেই রাজা তোমাকে বরণ করে নেবে। যে অনাথ সেনকে তুমি হত্যা করতে চেয়েছিলে সেও খুশি মনে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে। রথীন্দ্র নিজেও অপরাধী তাকে তুমি ক্ষমা করো কারণ তার সতোর জন্যই আজ তুমি দেবসমতুল্য স্বামীকে ফিরে পেলে, ফিরে পেলে রাজ্য, রাজ সিংহাসন। বিজয় সিংহের মত সন্তান.......আর কোন কথা নয় হেমাঙ্গিনী নেমে পড়ো।

হেমাঙ্গিনী বললো–আমি তোমার কোন অনুগ্রহ চাইনা বনহুর।

যে অপরাধ তুমি করেছে তার সমুচিত শাস্তি ছিলো মৃত্যুদন্ড। পুরুষ হলে সে শাস্তি থেকে রেহাই পেতেনা, নারী বলেই ক্ষমা পেয়েছে হেমাঙ্গিনী নইলে।

নইলে কি করতে তুমি?

আমার রিভলভার তোমার কৃতকার্যের জবাব দিতো। এসো হেমাঙ্গিনী- তোমাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু মনে রেখো হেমাঙ্গিনী এর পর যদি তুমি কোন রকম কুকর্ম করো তবে রেহাই পাবেনা।

বনহুর শেষ কথাগুলো এমন ভাবে বললো হেমাঙ্গিনীর কোন জবাব দেওয়ার মত সাহস হলো না। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

বজরা থেকে নামতেই সম্মুখে দেখতে পেলো একটি পাকি।

পালকী বাহকগণ রাজ কর্মচারীর পোশাকে সজ্জিত। ওরা ছাড়াও কয়েকজন অশ্বারোহী তারাও রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত।

বনহুর নেমে এলো বজরা থেকে, হেমাঙ্গিনী এতোক্ষণ বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। তাকে নতুন পোশাকে সজ্জিত দেখলো। পা-জামা পাঞ্জাবী, পায়ে জরির কাজ করা নাগড়া জুতো, মাথায় মনি মুক্তা খচিত টুপি।

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে এ পোশাকে।

একটি অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো বনহুর।

হেমাঙ্গিনী পাল্কীতে আরোহণ করলো।

বেশ কিছু সময়ের মধ্যে অদূরে পরিলক্ষিত রাজা মঙ্গল সিংহের, রাজপ্রাসাদ। সুউচ্চ রাজপ্রাসাদের কিছু অংশ নজরে পড়তে বোঝা গেলো রাজ প্রাসাদটিকে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে।

রাজপ্রাসাদ নজরে পড়লেও প্রাসাদে পৌঁছতেই সময় লাগলো অনেক। সমুদ্রতীর ছেড়ে বালুচর তারপর ছোট খাটো পাহাড় ও টিলা। তারপর গ্রামাঞ্চল

শস্যক্ষেত। এ সব পেরিয়ে রাজ প্রাসাদের সম্মুখে এসে পৌঁছলো রানী হেমাঙ্গিনীর পালকী এবং তার রক্ষী বাহিনী।

বনহুর অশ্ব থেকে নামলো।

রাজা মঙ্গল সিংহ তাকে অভিনন্দন জানালেন। অন্যান্য রাজ পরিষদ রাজা মঙ্গল সিংহের চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। রাজকুমার বিজয় সিংহও ছিলো সেখানে। অনাথ সেন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো মহারাজের পিছনে, তার মুখমন্ডল দেখে মনে হচ্ছিলো সে মোটেই খুশি নয়। তার ললাট ভ্রুকুঞ্চিত, চোখ দুটিতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। এক পাশে রথীন্দ্রনাথ, তার মুখে অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠেছে। মহারাজকে হত্যা না করে মহারাণীর বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য সে রাণীর কাছে অপরাধী।

অনাথ সেন বনহুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে রাজা মঙ্গল সিংহকে যেখানে রাখা হয়েছিলো সেখানে। সেখানেই অনাথ সেন এবং রথীন্দ্র সব কথা বলেছিলো রাজা মঙ্গল সিংহকে এবং মঙ্গল সিংহকে বলেছিলো বনহুর আপনি দেবতা সমতুল্য মানুষ, যদিও আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী আপনার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলো তবু সে নারী তাই ক্ষমার যোগ্য। আপনি তাকে ক্ষমা করলে এ যাত্রা তাকে আমি জীবনে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। বলুন রাজা মঙ্গল সিংহ- আপনি তাকে ক্ষমা করে আবার আপনার রাজ্যে রাণী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি আছেন?

রাজা মঙ্গল সিংহ মহৎ ব্যক্তি, তিনি তার মহত্বের গুণে ক্ষমা করে দিলেন এবং রাণী হিসাবে তাকে গ্রহণ করবেন বলে স্বীকার করেছিলেন।

রাণী হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে বনহুর যখন রাজ প্রাসাদে ফিরে এলো তখন সকলে উপস্থিত ছিলো।

অনেকে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলো, অনেকে কটুক্তি করতেও ছাড়লোনা। খুশি। হলোনা তেমন করে কেউ।

রাজা মঙ্গল সিংহ যখন রাণীর দিকে হাত দু'খানা প্রসারিত করে বললো–হেমা এসো। তোমার স্বর্ণসিংহাসন তোমার উপবেশনের প্রতিক্ষায় আছে। কেউ তোমার স্বর্ণসিংহাসন স্পর্শ করবে না।

হেমাঙ্গিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–মহারাজ আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। জানি আমি তোমার রাণী হবার যোগ্যতা হারিয়েছি তবু তুমি আমাকে ঘৃণা না করে আনন্দে অভিনন্দন জানালে। ঐ স্বর্ণ সিংহাসন আমার জন্য নয় আমি ঐ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবো আমার সন্তান বিজয় সিংহকে। এসো বিজয় একবার পূর্বের মত মা বলে ডাকো ……

হাত বাড়ালো হেমাঙ্গিনী বিজয় সিংহর দিকে।

বিজয় সিংহ এখন ছোট্টটি নাই সে এখন যুবক। সে এখন সব বোঝে জানে। নীরবে পিতার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার বিজয় সিংহ চোখ তুলে তাকালো বিমাতার মুখের দিকে। আজ আর সে মুখে নাই তিক্ততার আভাষ। মাতৃস্নেহের মাধুর্য পরিলক্ষিত হচ্ছে সে মুখে। মুহূর্তে বিজয় সিংহের মুখভাব প্রসন্ন হলো, সে ঝাঁপিয়ে পড়লো হেমাঙ্গিনীর বুকে, অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলোমা…মাগো…

উপস্থিত সবার চোখে অশ্রু ঝরলো।

অনাথ সেন বললো–আজ আমি তৃপ্ত।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

*

হেমাঙ্গিনীর প্রধান অনচর হরমোহন যখন জানতে পারলো রাণী হেমাঙ্গিনীকে বনহুর জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গেছে এবং রাজা মঙ্গল সিংহের সঙ্গে সুকৌশলে মিলন করিয়ে দিয়েছে। আরও একটি অপরাধ বনহুর করেছে সেটা হলো স্বর্ণসিংহাসন রাজা মঙ্গল সিংহের সন্তান বিজয় সিংহকে উপহার দিয়েছে।

হরমোহন ছিলো রাজসৈনিক এবং মঙ্গল সিংহের দেহরক্ষী। হেমাঙ্গিনীকে সেই গোপনে কুবুদ্ধি দিয়ে রাজা মঙ্গল সিংহের বিরুদ্ধাচরণে উদ্ভুদ্ধ করে। অবশ্য হরমোহন যখন বুঝতে পেরেছিলো, রাণী হেমাঙ্গিনীর রাজা মঙ্গল সিংহকে সুনজরে দেখেনা, তখনই সে কুবুদ্ধি আঁটে এবং প্রয়োগ করে সুদর্শণা রাণী হেমাঙ্গিনীর উপর।

ফল ভালই হলো। হরমোহন জয়ী হয়েছিলো রাণী হেমাঙ্গিনী যখন তার প্রিয়তম স্বামী মঙ্গল সিংহকে হত্যার জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলো। রানীকে তার কাজে

সলা পরামর্শ দিয়ে সে কিছু দিনের জন্য সরে পড়েছিলো, যেন কোন দোষ তার কাছে না চাপে।

কিন্তু ফিরে এসে যখন সে সব শুনলো, জানলো, তখন সে বুঝতে পারলো তার সলাপরামর্শ কার্যকর হয়েও হয়নি। বনহুর তার বুদ্ধি-কৌশল খাটিয়ে হরমোহনের সব ষড়যন্ত্র বিফল করে দিয়েছে। তখন হরমোহন উম্মাদ হয়ে উঠলো কেমন করে বনহুরকে এর শাস্তি দেওয়া যায়।

হরমোহন রাজকার্যে যোগ না দিয়ে সে হিন্দ্রল রাজ্যের অদূরে মহিসাখুর জঙ্গলে একটি পোভড়া বাড়ির অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে। বনহুরকে হত্যার প্রচেষ্টা চালালো। দলে সে মাত্র সাতজন সঙ্গী বেছে নিলো তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। আরও সংগ্রহ করলো মারাত্মক অস্ত্র যা দিয়ে সে অনায়াসে বনহুরকে কাহিল করতে পারে।

রাণী হেমাঙ্গিনীর জীবনের মোড় পাল্টে গেছে, সে স্বামীর সেবা যত্ন এবং বিজয় সিংহের প্রতি নিজ সন্তান সম দরদ আর স্নেহ দিয়ে রাজ পরিবারে ফিরিয়ে এনেছে নব জীবন।

রাজা মঙ্গলসিংহ নিজেও লাভ করেছে অনাবিল শান্তি। প্রজাদের মনেও অফুরন্ত আনন্দ উৎসাহ। কারণ রাজ পরিবারের আনন্দ তাদেরকেও সর্বকাজে উৎসাহী করে তুলেছে।

. রাণী হেমাঙ্গিনীর মনে মাঝে মাঝে হরমোহনের কথা স্মরণ হয়, লোকটা তাকে কুমন্ত্র দিয়ে অসৎ পথে চলার উৎসাহী করে সে সরে পড়েছিলো, বলেছিলো সময় হলেই সে ফিরে আসবে কিন্তু আজও সে ফিরে এলোনা কেন ভেবে পায়না।

হরমোহনকে নিয়ে রাণীর বেশীক্ষণ ভাববার সময় নেই এখন। হরমোহন ফিরে এসেছে হিন্দ্রলে। এসে সে যখন সব জানতে পেরেছে তখন আর তার রাণী হেমাঙ্গিনীর সংগে দেখা করার কোন ইচ্ছাই জাগেনি মনে। বরং একটা হিংসাতুক ইচ্ছাই তাকে উম্মাদ করে তুলেছে, যেমন করে হোক উচিৎ শিক্ষা সে হেমাঙ্গিনীকে দেবে।

কয়েক মাস কেটে গেলো হেমাঙ্গিনীর যখন স্বামী সংসার নিয়ে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছে তখন সে হেমাঙ্গিনীর সহচরী কিংকরীকে কৌশলে নিয়ে আসে তার

অতিথি ভবনে।

হরমোহন হিন্দ্রলে একজন প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বসবাস করছিলো। কিংকরীকে সুকৌশলে হিল বাস ভবনে নিয়ে আসে। তারপর তাকে মহামূল্যবান একটি হীরক আংটি উপহার দিয়ে হরমোহন কিংকরীর মন জয় করে নেয়। এরপর চলে গোপন আলোচনা হরমোহন আর কিংকরীর মধ্যে।

তারপর ফিরে আসে কিংকরী রাজপ্রাসাদে।

হেমাঙ্গিনীর প্রধান সহচরী বলে তার কোন বাধা ছিলোনা রাজ প্রাসাদে। যখন যেখানে যেমন খুশি প্রবেশের অধিকার ছিলো কিংকরীর।

কিংকরী ছিলো এক ফুলওয়ালীর মেয়ে।

মা ও মেয়ে প্রতিদিন সকাল বিকাল ফুল ও ফুলের মালা নিয়ে আসতো রাজ প্রাসাদে। হেমাঙ্গিনীর খুব ভাল লাগে কিংকরীকে। নিজের মনোবাসনা মহারাজ মঙ্গল সিংহের নিকট ব্যক্ত করে। মঙ্গল সিংহ হেসে বলেছিলেন-বেশ তো, তোমার যদি কিংকরীকে ভাল লাগে তবে সহচরী করে নাও।

হেমাঙ্গিনী মহারাজের মত পেয়ে কিংকরীকে সহচরী করে নিয়েছিলো।

সে আজ থেকে কমপক্ষে দশ বছর আগের কথা। হেমাঙ্গিনী সবে রাণী হয়ে রাজ প্রাসাদে এসেছিলো।

সহচরী হিসাবে সর্বক্ষণ পাশে পাশে থাকতো কিংকরী। মা ফুলওয়ালী গরিব বিধবা মহিলা। যুবতী কন্যাকে রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে আনন্দের সীমা ছিলো না তার। অভাব, রাক্ষসী অভাবের করাল গ্রাস থেকে মা ও মেয়ে মুক্তি পায়। হেমাঙ্গিনী প্রায়ই নানাভাবে কিংকরী মায়ের অভাব দূর করতো, এ কারণে ফুলওয়ালীর দুঃখ তেমন আর ছিলোনা।

কিংকরী রাজপ্রাসাদে যখন আসে তখন বয়স তার মোল বা সতের ছিলো, এখন ছাব্বিশ কিংবা সাতাইশ হবে। সুন্দরী, ছিমছাম চেহারা রূপে ঢল ঢলে তার গোটা অঙ্গ।

হরমোহন সহজেই কিংকরীকে হাত করে নেয়।

একদিন কিংকরী বলে-রানী মা চলুন না বজরায় চেপে নদী পথে কোন নতুন স্থানে যাওয়া যাক। সর্বক্ষণ এই রাজপ্রাসাদ আর ভাল লাগেনা। মনে হয় যেন আমরা বন্দিনী।

হাঁ, ঠিকই বলেছো কিংকরী, মুক্ত বিহঙ্গের মত ছিলাম। আমিই ছিলাম আমার জগতে একচ্ছত্রী সম্রাজ্ঞী। যখন যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে ফিরেছি আর এখন শুধু পাষাণ প্রাচীরে ঘোড়া রাজ প্রাসাদ, সত্যিই কোথাও ঘুরে এলে মন ভাল লাগবে।

তা হলে মহারাজকে বলুন রাণী মা! বললো কিংকরী।

রাণীর সাধ অপূর্ণ রাখেন না রাজা মঙ্গল সিংহ।

রাণী বলতেই রাজা রাজি হয়ে গেলেন এবং পুত্র বিজয় সিংহকে ডেকে বললেন-বিজয় সিংহ প্রসাদকে বলে দাও আমার বড় বজরাটিকে সুসজ্জিত করতে। তোমার মা ও কিংকরী নৌবিহারে যাবে। তুমিও যাবে তাদের সঙ্গে বুঝলে।

বিজয় সিংহ বললো–বেশ তত আনি জি, তোমার নির্দেশ পালন করবো। অনেক দিন নৌবিহারে যাওয়া হয়নি।

কিংকরী রাণীকে নির্জনে ডেকে বললো–রাণী মা রাজকুমার বিজয় সিংহ যদি আপনার সঙ্গে নৌবিহারে যায় তবে আমি যাবো না।

হেমাঙ্গিনী বললো–কেনো? রাজকুমার সঙ্গে থাকলে বরং ভাল হবে। সাহসী একজন লোক থাকা ভাল।

হেসে বললো কিংকরী, রাণী মা আমরা জানি যে কোন পুরুষের চেয়ে আপনি শক্তিশালী এবং সাহসী।

হাঁ, তা বটে। কিন্তু কেনো জানিনা আজকাল মনটা আমার বড় কোমল হয়ে গেছে। মাতৃত্বের স্বাদ আমাকে আচ্ছাদিত করেছে। বনহুর কি যাদু জানে যার দরুন আমার মধ্যে এ পরিবর্তন।

কিংকরী যেন চমকে উঠলো।

হেমাঙ্গিনী বললো–কিরে কিংকরী, অমন করে চমকে উঠলি কেনো?

আপনি যে কি করে ঐ নাম মুখে আনলেন…

কোন নাম?

বনহুর।

ও, হাসলো হেমাঙ্গিনী, বললো–বনহুর নামটা তোকে ভীত করে তুলেছে, তাই না?

হাঁ রাণী মা। শুনেছি পৃথিবীর সর্বস্থানে তার বিচরণ বিশ্ববিখ্যাত দস্যু নাকি সে? কিন্তু রানীমা আপনার কথায় মনে হচ্ছে বনহুরকে আপনি চেনেন।

সত্যি কিংকরী এমন ব্যক্তি হয়না। দস্য হলেও এক মহৎ হৃদয় মানুষ সে! ঐ ব্যক্তিই আমার কঠিন পাপময় জীবনকে করেছে আলোময় পবিত্র। হেমাঙ্গিনীর মুখে ফুটে উঠে একটা হাস্যজ্জল দীপ্তময় আভা।

কিংকরী মৃদু হাসলো। তার মনে উদয় হলো হরমোহন এর মুখ। তার সলাপরামর্শ সব ভেসে উঠছে হৃদয়াকাশে। কানের কাছে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো হরমোহনের কুপরামর্শগুলোর শব্দগুলো।

কিংকরীর কথা মত হেমাঙ্গিনী তৈরি হয়ে নিলো নৌকাবিহারে যাবে সে, সঙ্গে কিংকরী যাবে ঠিক হলো। কয়েকজন প্রহরী যাবে তাদের সঙ্গে। বিজয় সিংহের যাওয়া হলো না। বিমাতা হেমাঙ্গিনী বললো–বাছা তোমার যাওয়ার দরকার নাই। কারণ কিংকরী সঙ্গে রয়েছে আর রয়েছে চারজন প্রহরী।

বিজয় সিংহ বললো–যা ভাল মনে করেন তাই হোক।

*

নৌবিহারে গেলো হেমাঙ্গিনী।

কিংকরী ছাড়াও আরও দু’জন সহচরীকে রাজা মঙ্গল সিংহ দিলেন রাজরাণীর সঙ্গে।

মহারাজ রানীর জন্য বজরাখানাকে নতুন সাজে সাজিয়েছিলেন। মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে মনোরম করে বজরা সাজিয়ে দিলেন রানী যেন খুশি হয়।

রানী হেমাঙ্গিনী সহচরীদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

নহবৎ আর সানাই ধ্বনিতে ভরে উঠলো রাজপ্রাসাদ থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত সমস্ত হাজার হাজার প্রজাগণ পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে রানীজীকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো।

বজরায় পৌঁছতেই রানীজী ও সহচরীদের সানন্দে অভিনন্দন জানালো বজরার লোকজন। এরা সবাই বজরা রক্ষক এবং পরিচালক।

ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় বজরাখানা দোল খেয়ে খেয়ে ভেসে চললো। রানী হেমাঙ্গিনী সহচরীদের নিয়ে বজরার ছাদে এসে বসলো। সুন্দর ফুর ফুরে হাওয়ায় হাসি গল্পে মাতোয়ারা হলো রাণী ও রানীর সহচরীগণ।

সম্মুখে টেবিলে পরিচারিকা নানাবিধ খাদ্য সম্ভার দিয়ে গেলো। প্রাতঃভোজন সমাধা করলো রানী হেমাঙ্গিনী।

সমস্ত দিনটা কাটালো হাসি গল্প ও আনন্দের মধ্যে।

এক সময় বেলা ডুবে এলো।

অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মী মিশে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনী সহচরীদের নিয়ে বজরার মধ্যে প্রবেশ করলো।

কিংকরী ভাল গাইতে পারতো, গান গাইলো সে।

অনেক রাত।

হিন্দ্রল রাজ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে বজরা নোঙ্গর করেছে। চারদিকে শুধু ধুধু প্রান্তর।

বজরার অভ্যন্তরে সুসজ্জিত কামড়ায় দুগ্ধফেনিল শয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে হেমাঙ্গিনী। পাশের কামরায় সহচরীগণ নিদ্রামগ্ন, অনেক রাত্র পর্যন্ত জেগে থাকার দরুণ সবাই গভীর ঘুমে অচেতন।

এমন সময় বজরার অদূরে আর একটি নৌকা এসে থামলো। নৌকার ভিতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো হরমোহন। হাতে তার একটি কালো রুমাল। কিংকরী তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো বজরায়। সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও কিংকরী ঘুমায়নি। তার মনের গহনে বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো রহমানের কথা গুলি। বজরা যেখানে নোঙ্গর করবে আমার নৌকা সেখানে পৌঁছবে। যখন শুনবে একটা বাঁশীর শব্দ তখন বুঝবে আমি পৌঁছে গেছি।

কিংকরী সজাগ ছিলো।

বাঁশীর শব্দ কানে যেতেই কিংকরী সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো বজরার বাহিরে।

হরমোহন কিংকরীর হাত ধরে বজরায় উঠে এলো, চাপা কণ্ঠে বলল-কিংকরী। সাবাস, তুমি আমার কথামতই কাজ করেছে। প্রহরীগণ ও মাঝিদের…।

হাঁ, আমি সবাইকে জলের সঙ্গে ঔষধটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কেউ আপনার কাজে বাধা দিতে আসবেনা।

হরমোহনের মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো।

আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শুধু তারার মালা টিপ টিপ করে জ্বলছে।

সেই সামান্য আলোর ছটায় কিংকরী হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে কামরায় হেমাঙ্গিনী ঘুমাচ্ছিলো।

হরমোহনের চোখ দুটো হিংস্র শার্দুলের মত জ্বলে উঠলো। সে কালো রুমালখানা হাতের মুঠায় শক্ত করে ধরে ঐ কামরায় প্রবেশ করলো যে কামরায় রানী হেমাঙ্গিনী ঘুমিয়েছিলো।

কিংকরী দাঁড়িয়ে রইল দরজার পাশে।

রানী হেমাঙ্গিনী দুগ্ধফেনিল শয্যায় শয়ন করে অঘোরে ঘুমাচ্ছিলো।

হরমোহন নিদ্রিত হেমাঙ্গিনীর মুখে কালো রুমালখানা চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর দেহটা নড়ে উঠলো তারপর নীরব।

এবার হরমোহন রানী হেমাঙ্গিনীর সংজ্ঞহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো কামরা থেকে এবং সুকৌশলে হরমোহন পার হয়ে গেলো তার নিজ নৌকায়।

কিংকরী এবার ফিরে এলো নিজ শয্যায়।

নিজ শয্যায় শুইয়ে দিলো হরমোহন রাণী হেমাঙ্গিনীকে। তারপর সে নৌকার বাইরে বসে মাঝিদের নির্দেশ দিলো-মাঝি যত তাড়াতাড়ি পার নৌকা বাইয়ে চলো, আমার মহিসাখুর পৌঁছতে হবে রাত্রির অন্ধকারে।

মাঝিগণ হরমোহনের নির্দেশ মত নৌকা বাইয়ে চললো।

*

ভোর হবার পূর্বে হরমোহনের নৌকা পৌঁছে গেলো তার গন্তব্য স্থানে। ইতিমধ্যে সংজ্ঞা ফিরে এলো রানী হেমাঙ্গিনীর। চোখ মেলতেই দেখলো সে চারদিকে অন্ধকার। এক পাশে একটি লণ্ঠন জ্বলছে। লন্ঠনের আলোতে সে দেখলো একটি ছায়ামূর্তির মত কে একজন বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

হেমাঙ্গিনী শয্যায় উঠে বসলো।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো এটা তাদের বজরা নয়। নৌকা দোল খাচ্ছে তাতেই হেমাঙ্গিনী আঁচ করে নিলো, কোন একটা নৌকায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লোকটা কে? প্রশ্ন জাগলো তার মনে। আর তাকে কারাই বা নিয়ে এসেছে বজরা থেকে এ নৌকায়।

ভাল করে লক্ষ করলো কিংকরী। তার পাশের বিছানায় কিংকরী শুয়ে ছিলো। কিন্তু এটাতো সে বজরা নয়, কিংকরী বা তার শয্যাও নেই। তবে কোথায় সে।

এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো-লড়া রাণীজির জ্ঞান ফিরেছে কি?

লড়া! কে এই লড়া! কণ্ঠস্বরটি হেমাঙ্গিনী কোথাও যেন শুনেছে, কেমন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

লড়া! তবে ঐ ব্যক্তি যাকে সে ছায়ায় বসে বসে ঝিমুতে দেখেছে।

লড়া কোন জবাব দেবার পূর্বেই হেমাঙ্গিনী দু'চোখ বন্ধ করে শয্যায় পড়ে রইল। লড়া আসন ছেড়ে উঠে এলো, লণ্ঠনের সলতে বাড়িয়ে দিয়ে বললো–মালিক রাণীজীর, জ্ঞান এখনও ফেরেনি। ফিরলে জানাবো...কথাটা বলে লড়া আবার তার আসনে এসে বসলো এবং আবার সে ঝিমুতে শুরু করলো।

হেমাঙ্গিনী চোখ খুলে একবার দেখে নিলো তাকে।

কান পেতে শুনতে লাগলো, সেই কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে তার কানে। কাউকে বলছে-আমাদের নৌকা এসে গেছে কিন্তু রাণীর সংজ্ঞা ফিরে আসছে না এখনও। ভোর হবার পূর্বে আমাদের জঙ্গল বাড়িতে পৌঁছতে হবে।

অপর একটি কণ্ঠমালিক, এত ভাবনার কি আছে। হুকুম করুন রাণীকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আমরা জঙ্গল বাড়িতে পৌঁছতে পারবো।

কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে।

আরও একটি কণ্ঠস্বর-এই গহীন জঙ্গলে লোক কোথায় মালিক। এ রাজ্য তো আপনার।

হাঁ, আর বিলম্ব করোনা, যাও রানীকে তুলে নিয়ে নৌকা বিদায় করে দাও। বললো হরমোহন।

হেমাঙ্গিনী সব শুনলো সে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো।

হঠাৎ একটু শব্দ হলো।

হরমোহন বললো–দেখো তো রানীর জ্ঞান ফিরলো কিনা?

লোকটা নৌকার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে বললো–মালিক রাণীজীতে বিছানায় নেই।

বলো কি লড়া।

হাঁ মালিক।

হরমোহন দ্রুত প্রবেশ করলো নৌকার ভিতরে। বিছানা শূন্য পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি নৌকার বাইরে এসে খোঁজাখুজি করতে লাগলো হরমোহন।

ওদিকে রানী হেমাঙ্গিনী হামাগুড়ি দিয়ে নৌকার ওপাশের খিরকী দিয়ে বেরিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে শব্দ হলো।

হরমোহন বুঝতে পারলো রানী হেমাঙ্গিনী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাহলে সে জ্ঞান লাভ করে সব কিছু অনুধাবন করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। মুহূর্তে বিলম্ব না করে হরমোহনও ঝাঁপিয়ে পড়লো নদী বক্ষে। অন্ধকারে প্রথমে নজরে না পড়লেও ঝুপ ঝাঁপ শব্দে হরমোহন অন্ধকারেও রাণী হেমাঙ্গিনীকে ধরে ফেললো। হরমোহন তাড়াতাড়ি রশি নামিয়ে দেবার জন্য নিজ অনুচরদের চিৎকার করে বললো।

হরমোহনের তিনজন সহকারী এ নৌকায় ছিলো। তারা দ্রুত নৌকা থেকে মোটা রশি নামিয়ে দিলো।

এদিকে ততক্ষণে ভোরের আলো সমস্ত পৃথিবীটাকে ধুসর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ভোরের আলোতে কিছু কিছু নজরে আসছে। হরমোহনের সঙ্গী তিন জন রশি ধরে চেষ্টা করছে হরমোহনের হাতের কাছে।

হেমাঙ্গিনী হরমোহনের সঙ্গে পানির মধ্যেই ধস্তাধস্তি করছে। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না হরমোহন তাকে।

হেমাঙ্গিনী ক্রমেই হাঁপিয়ে পড়লো।

হরমোহন তুলে আনলো হেমাঙ্গিনীকে।

সহচর তিনজন সাহায্য করলো হরমোহনকে। তার হাত থেকে রাণী হেমাঙ্গিনীকে নৌকায় তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল। রাণী হেমাঙ্গিনীকে শুইয়ে দিতেই সে চোখ মেললো।

ভোরের আলো তখন দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

হরমোহনের উপর এবার দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময় ভরা গলায় বললো হেমাঙ্গিনী-হরমোহন তুমি!

হাঁ, আমি আপনার পুরাতন হিতৈষী বন্ধু হরমোহন।

তুমি আমাকে আমার বজরা থেকে উঠিয়ে এনেছো? কথাগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে বললো হেমাঙ্গিনী। নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর পানিতে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলো হেমাঙ্গিনী। তারপর হরমোহনের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করে ভীষণ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো সে, কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো, তবুও রাগে কঠিন কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলো হেমাঙ্গিনী।

তা দেখতেই পাচ্ছেন রাণীজী। আমি আপনাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি মাত্র। হরমোহন বললো।

উদ্ধার! আমাকে তুমি সর্বক্ষণ কুপরামর্শ দিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছে তার জন্য আমি তোমাকে অভিশম্পাত করছি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো হরমোহন।

হেমাঙ্গিনী কোন রকমে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো–হরমোহন তুমি যদি তোমার মঙ্গল চাও তবে আমাকে রাজ প্রাসাদে পৌঁছে দাও। নচেৎ...

হাসি থামিয়ে বললো হরমোহন-নচেৎ আপনি কি করবেন?

তোমাকে আমি হত্যা করবো।

পারবেন আমাকে হত্যা করতে? রাজা মঙ্গল সিংহকেই আপনি পারেননি হত্যা করতে। বনহুর আপনাকে দেখছি একটি সৎ নিষ্ঠাবান মহিলাতে পরিণত করেছে।

খবরদার, তুমি এ পাপ মুখে বনহুর নাম উচ্চারণ করবে না।

ওঃ বনহুর দেখছি তোমাকে দেবী নামে ভূষিত করেছে।

হাঁ, তার সংস্পর্শে আমি মহৎ নারী হিসাবে পরিণত হয়েছি। সত্যি বনহুর দেবতা।

হাঃ হাঃ হাঃ একটি নরপশু দস্যুকে তুমি দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। যে ব্যক্তি বিশ্ববাসীর আতঙ্কের কারণ। যে ব্যক্তি মানুষকে অমানুষের মত হত্যা করে, যে ব্যক্তি মানুষের সর্বস্ব লুটে নেয়, যে ব্যক্তি নারীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়।

হরমোহন তুমি যা বলছে তা সত্য নয়। নারীর মর্যাদা সে কোনদিন ক্ষুণ্ণ করে না, নারী জাতাঁকে সে শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয়। মানুষ সে হত্যা করে, যারা তোমার মত পাপিষ্ঠ। তোমার মত অমানুষ যারা, তাদেরই আতঙ্কের কারণ সে, ধন সম্পদ লুটে নেয় সত্য তা ঐ ব্যক্তিদের যারা গরিব অসহায়দের সম্পদ লুটে নিয়ে ঐশ্বর্যের ইমার গড়ে তোলে। সেই সব অন্যায় অত্যাচারীদের ধন সম্পদ লুটে নিয়ে যারা নিঃস্ব রিক্ত অসহায় তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। তাদের মুখে হাসি ফোঁটানোই তার উদ্দেশ্য। নারীজাতীর উপর তার শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, পবিত্র সে নিজেও একজন পবিত্র। মানুষ।

রানীজী আপনি বনহুরকে হৃদয় আসনে স্থান দিয়েছেন, আমি তা হতে দেবোনা। সে স্বর্ণসিংহাসনের লোভে আপনাকে হাত করে স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়।

না, তোমার কথা মোটেই সত্য নয়।

কোন কথা শুনতে চাই না, সঙ্গীদের ইঙ্গি করলো হরমোহন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন পালোয়ান তুলে নিলো রাণী হেমাঙ্গিনীকে কাঁধে।

হেমাঙ্গিনী হাত পা আছড়ে নিজকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। হেমাঙ্গিনী একেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিলো তারপর সে হরমোহনের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে আরও কাহিল হয়ে পড়েছিলো, কাজেই সে বড় ক্লান্ত অবসন্ন। হরমোহনের অনুচর তিনজন অতি সহজেই তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে বহন করে চললো তাদের মহিসাখুর জঙ্গলের গোপন গোড়ো বাড়িটার উদ্দেশ্যে।

*

অনেক দিন পর বনহুরকে পাশে পেয়ে মনিরার দু'চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো। অনেক কথা জমা হয়ে থাকলেও কণ্ঠ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছিল না তার।

বনহুর মনিরাকে কাছে টেনে নিলো, মৃদু হেসে বললো–মনিরা তোমার চোখে পানি। কত দিন পর এসেছি তোমার হাসি মুখ দেখবো বলে আর তুমি অশ্রু বিসর্জন করছো। কেন মনিরা লক্ষ্মিটি কেনো কাঁদছো তুমি?

এতদিন পর তোমাকে কাছে পেয়েছি এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। তাই বড় আনন্দ হচ্ছে আমার……আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো মনিরা।

তাই বুঝি! মনিরা তোমার চোখে পানি দেখলে আমি ধৈর্যচ্যুত হই। সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলি। জানো তোমার নুর-এর সহায়তায় আমি আমাদের নতুন বাহন চালিয়ে সেই দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে হিরোইন প্রস্তুতকারী দল সহ তাদের কারখানা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছি।

বললো মনিরা-সবই শুনেছি নূরের মুখে। কি ঝুঁকি নিয়েই না তোমরা ইহোল মাংলতে গিয়েছিলে। আল্লাহ সহায় ছিলেন তাই তোমরা জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে।

হাঁ মনিরা, সে কথা সত্য। আল্লাহর নিকটে লাখো লাখো শুকরিয়া। বৈজ্ঞানিক লর্ডের কন্যা মিস মেরীকে ঐ নরপশুদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা, এ জন্য অনেক খুশি হয়েছেন মিঃ লর্ড।

মেরী কি ওর বাবার কাছেই আছে?

হাঁ।

শুনেছি আজকাল নূর প্রায়ই মিঃ লর্ডের ওখানে যায়।

হয়তো যায়।

শুধু যায় না, মিস মেরীও আসে নূরের বাংলোতে।

তাতে কি, এলোইবা।

তুমি বুঝবে না।

যা ভাবছো মনিরা, তা নয়, মেরীকে তুমি দেখোনি। সত্যি মেয়েটা সৎ চরিত্রা।

মনিরা বললো–অমন কত মেয়েই তো দেখেছি। যার পাল্লায় তুমি পড়েছে সেই তোমাকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তোমারইতো ছেলে নূর।

একটা মেয়ে যদি কাউকে পাবার জন্য উন্মুখ বা কাউকে ভালবাসে বলল তাতে দোষ কি। ভালবাসা ভাললাগা এটা তো পবিত্র একটা সম্পদ। বলো তুমিও কি একদিন আমাকে ভালবাসোনি?

বেসে ভুলই করেছিলাম। সেদিন বুঝিনি তুমি...

বল, থামলে কেনো?

তুমি বড় নিষ্ঠুর।

সত্যি আমি কি নিষ্ঠুর! যদিও আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করে বসি কিন্তু সত্যি আমারও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করি।

তুমি কি এখনও ছেলে মানুষ। তুমি বোঝনা যা তুমি করো তা অন্যায়।

আমার কাজকে তুমি অন্যায় মনে করো মনিরা?

হাঁ, করি।

মনিরা!

তুমি মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করো। অপরের ধন সম্পদ তুমি হরণ করো একটু থেমে বললো–দস্যু নামটা তোমার সার্থক হয়েছে।

মনিরা তুমি যা বলছে তা আমার কাছে অন্যায় নয়। কোন মানুষকে আমি হত্যা করিনি, যাদের হত্যা করেছি তারা অমানুষ হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র। আর অপরের সম্পদ লুটে বা হরণ করে নেবার কথা বললে, তাও সেই কথা, সভাবে যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের এক কপর্দক সম্পদও আমি বা আমার অনুচরগণ লুণ্ঠন করবে না বা করেনি কোন দিন। যা লুণ্ঠন করেছি ঐ অমানুষ যারা তাদের এবং তা বিলিয়ে দিয়েছি মানুষ যারা তাদের মধ্যে। মনিরা সবই তো জানো তুমি। একটু থেমে বললো বনহুর, যারা মানুষ, তারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করেও এক মুষ্টি অন্ন জোটেনা তাদের মুখে। অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়,

রাত্রিকালে যাদের পথ ঘাট মাঠ আশ্রয় স্থল জীবন যাদের দুঃখে ভরা, তারাই তো আসল মানুষ। আমি তাদেরে ভালবাসি, তাই আমি অমানুষদের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দেই তাদের মধ্যে। তাতে আমি আনন্দ পাই।

কিন্তু তোমার জন্য তো কারো মন কাঁদেনা, কেউ তো তোমার দুঃখ বোঝেনা বা বুঝতে চেষ্টা করেনা। সবাই জানে তুমি পিশাচ, তুমি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন,

তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ মহল হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তোমাকে আটক করা হলে সবার মুখে হাসি ফোটে। তোমাকে হত্যা করলে তাকে কোটি কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না মনিরা! ওরা আমার বন্ধু যারা আমাকে হত্যা করতে চায়...কথাটা বলে হাসে বনহুর।

কি মানুষ তুমি!

অমানুষ তো নই। যাক ওসব কথা, এবার আমি একটা নূতন গল্প বলবো তোমাকে।

নূতন গল্প কি? তোমার গল্প বলো।

মহেন্দ্র আর হিন্দ্রল পাশাপাশি দুটি রাজ্য। হিন্দ্রল এর রাজা মঙ্গল সিংহের স্ত্রী রাণী হেমাঙ্গিনী। রাজা মঙ্গল সিংহকে হত্যা করে সে স্বর্ণ সিংহাসনের একচ্ছত্রী সমাঙ্গী হয়েছিলো। রাজার কিছু কর্মচারীর সহায়তায় সে স্বামীকে হিংস্র ব্যাঘ্রের দ্বারা হত্যা করে।

নারী না পিশাচী সে? বলো তারপর? বললো মনিরা দু'চোখে তার বিস্ময়।

বনহুর বললো–আসলে রাজার অনুচর যার উপরে রাজাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো সে রাজার জামা কাপড়ে হরিণের রক্ত মাখিয়ে মিথ্যা থোকা দিয়েছিলো রাণী হেমাঙ্গিনীর কাছে।

রাজার কর্মচারিটি মহৎ ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই বলো তারপর?

তারপর সে মানে হেমাঙ্গিনী উচ্ছল হয়ে উঠে। কিছু দলবল নিয়ে সে একটি পর্বতের গহ্বরে স্বর্ণ সিংহাসন তৈরি করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। চোরাচালানী করে সে নানা দেশ থেকে খাঁটি সোনা আমদানি করে। যাকে ইচ্ছা তাকে সে বন্দী করে এবং নানা ভাবে তাদের উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার।

এ সংবাদ পেয়েই বুঝি তুমি ছুটে গিয়েছিলে হিন্দ্রল রাজ্যে।

হাঁ, এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

তুমি না জানিয়ে চলে গেলেও আমি সবই জানি।

তবে আর শুনে কি লাভ বলো?

তোমার মুখে সব শুনতে চাই, কারণ তুমি হিন্দ্রল গেছো কেন তা জানিনা।

তবে শোন মহারাজ মঙ্গল সিংহকে হেমাঙ্গিনী হত্যা করার নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশ পালন করেনি তার কর্মচারী, রাজা মঙ্গল সিংহকে জীবিত রাখা হয় এক গোপন গুহায়। বনহুর সমস্ত ঘটনা মনিরার কাছে বলে যায়।

মনিরা সব শুনে অবাক হয়। তেমনি খুশিও হয় সে। বলে মনিরা, পিশাচী একটি নারীকে তুমি মহৎ করতে পেরেছো এ কথা আমাকেও আনন্দিত করেছে।

সত্যি মনিরা আমি নিজেও তৃপ্ত।

কিন্তু তুমি যে বললে এতোগুলো লোককে তুমি হত্যা করেছো?

হাঁ, একটি রাজ্য এবং রাজাকে বাঁচাতে গিয়ে আমি হেমাঙ্গিনীর সহকারী গণকে হত্যা করেছি।

বললো মনিরা-এখন কি হেমাঙ্গিনী তার স্বামী পুত্রকে মেনে নিতে পেরেছে?

হাজার হলেও সে নারী এরা বরাবর কোমল হৃদয়, স্নেহময়ী ধর্মশালী হয়। হয়তো এ গুণগুলো তাকে সৎ ও মহৎ করে তুলেছে।

থাক তোমার কাহিনী-এবার বলো সংসারী হবে না তুমি? চিরদিন তোমার নেশায় বিভোর থাকবে।

নেশা নয় পেশা, কিন্তু পেশা থেকে সরে এলেই কি পুলিশ মহল আমাকে আনন্দে গ্রহণ করতে পারবে মনিরা। যত মহৎ কাজই আমি করিনা কেনো, পুলিশ মহল তা মেনে নেবেনা।

আমি বলবো, এই যে দেশ ব্যাপী যুব মহলকে পঙ্গু করে দেবার চক্রান্ত চলছে, নানা ধরনের মাদকদ্রব্য ব্যবহারে দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই হিরোইন প্রস্তুত কারখানা কি ভাবে কৌশলে তুমি সমূলে ধ্বংস করেছে। কি ভাবে তুমি হিরাঝিলের তলদেশে মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ীদের গুদাম আবিষ্কার করে সমস্ত মাদকদ্রব্য এবং সর্ব নাশা হিরোইন বিনষ্ট করেছে। কি ভাবে হাজার হাজার চোরা চালানীদের সায়েস্তা করেছে.....

কিন্তু তাতে কি পুলিশ মহল তোমার কথা মেনে নেবে?

কেন নেবেনা, আমি বলবো, নূর বলবে, সবাই জানে তুমি দস্যু হলেও তুমি মহৎ সবার চেয়ে।

হাসলো বনহুর, তারপর বললো–মনিরা আমার কি ইচ্ছা হয়না তোমাদের পাশে সর্বক্ষণ থাকি। সংসারী হয়ে আমি সবার পাশে নিজকে প্রতিষ্ঠা করি, কিন্তু তা হবার নয়।

কেনো হবার নয়?

ও তুমি বুঝবে না। নেশা বা পেশা দুটোই সমান। এ ছাড়া আমি দস্যুতা করি কেন তুমি হয়তো তা জানোনা। আমার বাপুজী আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলো, আমি যেন অন্যায় কোন কাজ না করি। জানি দস্যতা অন্যায়, তবু আমি দস্যতা করি আমার নেশা ও পেশা দুটোই। দস্যুতা করে আমি যে সম্পদ লুটে নেই তা আমি বিলিয়ে দেই অনাথ অসহায় দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে। এটা যদি অন্যায় হয় তবে আমি অন্যায় করছি, আর যদি মহৎ কাজ হয় তা হলে আমি নাচার। মনিরা তুমিই বলল, যারা নিরীহ অসহায় মানুষদের শোষণ করে ঐশ্বর্যের ইমার গড়ে তুলেছে যাদের টেবিলে নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় শয়ন করেও যারা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে, আমি তাদের সহ্য করতে পারি না। আমার ধমনির রক্তে আগুন ধরে যায়। বলো মনিরা সেটা কি আমার অপরাধ?

জানিনা! আমি জানি না বনহুর, কেন তুমি সহ্য করতে পারোনা, তোমার মত শত সহস্র মানুষ আছে তাদের কি এমন হয় না। তারা কেমন করে সহ্য করে, দেখেও না দেখার মত নিশ্চিন্তে বসবাস করে, নাকে তেল দিয়ে ঘুমায়। সবাই যদি তোমার মত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতো তা হলে দেশ আজ.........

এ সব ভেবে কোন ফল হবে না মনিরা।

এমন সময় বৃদ্ধ সরকার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসেন উপরে। বলেন তিনি- ঘোট সাহেব-ছোট সাহেব-দরজা খুলুন।

সরকার সাহেবের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায় মনিরা এবং বনহুর, দরজা খুলে মনিরা বলে কি সংবাদ সরকার চাচা?

পুলিশ-পুলিশ বাড়ি ঘেড়াও করে ফেলেছে-হাঁপাতে হাঁপাতে কথাটা বলে সরকার সাহেব।

মুহূর্তে মনিরার মুখ কালো হয়ে যায়, সে তাড়াতাড়ি স্বামীর পাশে এসে বলে.....পুলিশ জানতে পেরেছে তুমি এসেছো। যাও, চলে যাও তুমি এতোটুকু সময় পাশে পেয়েছিলাম এতো সুখ আমার ভাগ্যে সইবে না।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিরার কক্ষের সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেলো। একটি কথাও সে বললোনা।

মনিরার কানে স্বামীর কিছু পূর্বের কথাগুলো বাজতে লাগলো। বলেছিলো বনহুর–পুলিশ আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেনা, পুলিশ আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেনা মনিরা...এ কথা মিথ্যা নয়, বনহুর সমাজে এসে সাধারণ মানুষের মত বসবাস করতে চাইলেই কি পারবে? তা হতে দেবেনা কেউ...একটু পূর্বেই সে স্বামীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিলো, স্বামীর স্পর্শ এখনও তার সমস্ত শরীরে অনুভূত হচ্ছে।

এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ হাসনাত প্রবেশ করলেন তার সঙ্গে পুলিশগণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ইন্সপেক্টরের সংগে সরকার সাহেব, মনিরাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর-আমরা আপনার কক্ষে তল্লাশি চালাতে চাই.......

মনিরা শান্ত কণ্ঠে বললো–আসুন, দেখুন যা দেখবার আছে।

ইন্সপেক্টর হাসনাত ঘরের ভিতরে এবং পাশের কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে দেখলেন তারপর বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাইরে পুলিশগণ আগ্নেয় অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছিলো তারাও মিঃ হাসনাতের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করলো। মনিরা কক্ষে বসে শুনতে পেলো কয়েক খানা জিপ গাড়ির শব্দ। পুলিশ মহল কেমন করে জানতে পেরেছিলো বনহুর আজ রাতে মনিরার কাছে আসবে। নিশ্চয়ই এমন কেউ আছে তাদের বাড়িতে অথবা পাশের বাড়ির কেউ হবে।

অনেক কিছু ভাবে মনিরা, বিদায় মহর্তে স্বামীর ম্লান মুখ খানা বার বার ভেসে উঠে চোখের সামনে। নির্ভীক স্বামীকে আজ যেন সে নতুন রূপে দেখলো। সমস্ত রাত ঘুমাতে পারেনা মনিরা।

এক সময় ভোর হয়ে আসে।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো মনিরা। তখন মোটর থামার শব্দে তন্দ্রা কেটে যায় তার। শয্যায় উঠে বসে, তাকায় জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। ভোরের সূর্য উদয় হচ্ছে সবে মাত্র।

জানালার পাশে একটি দেবদারু গাছ ছিলো, এই গাছটি সে এ বাড়িতে আসার পর থেকেই দেখে আসছে। বনহুর প্রথম এই দেবদারু গাছ বেয়েই এসেছিলো তার ঘরে। তারপর কতবার বনহুর এই দেবদারু গাছের সাহায্য গ্রহণ করে তবেই না তার সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছে। সেই দেবদারু গাছ আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

ততক্ষণে নর কক্ষে প্রবেশে করে ডাকে-মা মনি।

কে, বাবা নূর! মনিরার চোখে পানি এসেছিলো স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়, বেশ কিছু দিন নূর আসতে পারেনি ব্যস্ততার জন্য। আজ সন্তানকে পেয়ে দুচোখ বেয়ে পানি আসছিলো তার।

নূর বললো–আম্মু আমি সব শুনেছি। আব্বু এসেছিলেন অথচ তাকে পুলিশ……

হাঁ বাবা, তোর আব্বুকে পুলিশ একটু স্বস্তি পেতে দেয়নি। কথাটা বলতে গিয়ে মনিরার গন্ড বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে।

নূর রুমাল দিয়ে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে, কেঁদোনা মা মনি, তোমার চোখে পানি আমি সহ্য করতে পারিনা।

নূর!

বলো আম্মু!

তোর আব্বুকে আজও সংসারী করতে পারলাম না। এটাই আমার বড় দুঃখ। ক্রমান্বয়ে বয়স বাড়ছে তবু তার স্বভাব পাল্টালো না।

আম্মু আমি জানি, আব্বু কোন অন্যায় কাজ করেন না তবু তিনি অপরাধী, আর তিনি যে অপরাধ করেন তা দেশের অসহায় মানুষদের মুখে হাসি ফোঁটানোর জন্যই করেন।

তাতে কি লাভ তার বুঝিনা।

তুমি তা বুঝবে না আম্মু? লাভ আত্ন তৃপ্তি......আব্বু ফিরে গেছেন তার আস্তানায় এবং নিরাপদেই আছেন। তুমি কিছু ভেবোনা আম্মু।

ভাবিনা, কিন্তু ভাবনা যে আসে আপনা আপনি।

আম্মু চলো আমার বাংলায় চলো। ভাল লাগবে...

না নূর, আজ আমি কোথাও যাবো না।

কেন আম্মু?

ও তুই বুঝবি না নূর।

থাক, তা হলে কাল তোমাকে নিতে আসবো। কদিন আমার ওখানে থেকে আসবে।

তা কাল হোক, তখন হবে।

তবে এখন চলি আম্মু?

একটু বস বাবা, নাস্তা দিতে বলি।

আজ দেরী করবো না আম্মু। একজন আসার কথা আছে।

কে বল না বাবা?

তুমি চিনবে না।

সেই বৈজ্ঞানিক মিঃ বার্ডের মেয়ে মিস মেরী?

হ্যাঁ আম্মু, তুমি কি করে বুঝলে?

আমি সব জানিরে সব জানি।

আব্বু বুঝি বলেছেন?

তিনি বলবার আগেই আমি শুনেছি কিন্তু…

বল আম্মু থামলে কেন? কিন্তু কি।

আমার যেন কেমন মনে হয়। হাজার হলেও তারা বিদেশী মেয়ে। সে কেন বার বার তোর বাংলোয় আসে?

ও বড় একা এ দেশে, একমাত্র ওর বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। হিরাঝিলের গহ্বরে ওর বন্দী হয়ে থাকতে ভাল লাগেনা, তাই আমার এখানে আসে। ওকে দেখলে তোমারও ভাল লাগবে, বড় মিষ্টি মেয়ে। তাছাড়া মিস মেরীর সহযোগীতায় আমরা হিরোইন প্রস্তুত ঘাটি ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য প্রথমে সে বাধা স্বরূপ হয়েছিলো, তারপর যখন তাকে বোঝানো হলো, হিরোইন শুধু দেশ ও জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছেনা, সমস্ত পৃথিবীর যুব শক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তখন সে আমাদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসে।

এমন সময় হোসেন বাবুর্চি এসে বললো–আম্মা ছোট সাহেব এর নাস্তা টেবিলে দিয়েছি।

নূর বললো–হোসেন তুমি বড় খেয়ালী। সত্যি আম্মু আমার কিন্তু বড় পিপাসা বোধ হচ্ছিলো। এসো আম্মু, তুমিও চা নাস্তা খাবে, এসো।

তুমি যাও বাছা, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

নূর চলে গেলো। খাবার টেবিলে বসে বললো–সর্বনাশ এত কিছু তৈরি করলে কখন!

ছোট সাহেব, মা মনি রোজ কত নাস্তা তৈরি করে ফিরিজে রাখেন, শুধু তার জন্য।

তাই নাকি?

হাঁ, ছোট সাহেব আপনি জানেন না এসব কিছু তিনি মুখে দেন না, বললে বলেন, আমার নুর আসবে তার জন্য এ সব করে রাখি। আপনার জন্য প্রতিদিন তিনি প্রতিক্ষা করেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে হোসেন মিয়া।

এমন সময় মনিরা আসে-নূর আমার জন্য অপেক্ষা করছিস বুঝি?

বসো আম্মু। এতো সব তৈরি করে কেন রেখে দাও বলো তো।

তুই তো বলে কয়ে আসিস না বাবা, তাই হঠাৎ যদি এসে পড়িস তাই রোজ আমি…

এখানে যখন মা এবং সন্তানে কথা হচ্ছিলো তখন বনহুর আর রহমানের কথা হচ্ছিলো, রহমান বললো–সর্দার হেমাঙ্গিনীকে কে বা কারা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। রাজা মঙ্গল সিংহ অনেক সন্ধান করেও তার কোন খোঁজ খবর পাননি।

এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে রহমান?

আমাদের অনুচর মাহাংগুর কাছে জানতে পারলাম।

মাহাংগু কি হিন্দ্রল রাজ্যে ছিলো?

হাঁ সর্দার, আপনি তো তাকে হিল রেখে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন সে যেন রাজপরিবারের উপর ভাল ভাবে লক্ষ রাখে।

মাহাংগু কি হিন্দ্রল থেকে এখানে এসেছে?

না সর্দার, সে সংবাদটা পাঠিয়েছে। অনেক সন্ধান করেও রাণী হেমাঙ্গিনীর কোন খোঁজ পাননি রাজা মঙ্গল সিংহ।

রহমান, তা হলে এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে।

আমারও তাই মনে হয়।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে এলো দরবার কক্ষের বাইরে। বনহুর বললো– রহমান, তুমি তো জানো একদল নর পশু ফুল্লরাকে ঝর্ণার পানিতে গোসলের সময় তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।

হা সর্দার, তাকে আপনি সেই নর পশুদের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন।

শুধু ফুল্লরাই নয় আরও কয়েকজন তরুণীকে তারা সেখানে আবদ্ধ করে রেখেছিলো। তাদের উপর চালাচ্ছিলো অমানুষিক অত্যাচার।

আপনি তাদেরকেও উদ্ধার করেছিলেন......এবং সেই নরপশুদের হত্যাও করেছিলেন।

হাঁ, আমি তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছি রহমান। দেশ ছেয়ে গেছে অন্যায় অত্যাচারীদের নির্মম অত্যাচারে। রহমান হেমাঙ্গিনী কি আত্নগোপন করেছে না কেউ তাকে সরিয়ে ফেলেছে।

সেটাই বোঝা যাচ্ছে না সর্দার।

সেদিন বেশি কথা-বার্তা হলোনা। হেমাঙ্গিনীর নিরুদ্দেশ ব্যাপারটা বনহুরকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। নিজ বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে পায়চারী করতে লাগলো সে।

*

হরনাথ, তোমার এতো বড় সাহস, তুমি আমাকে ছলনা করে কিংকরীর দ্বারা ষড়যন্ত্র করে, আমার স্বামী সন্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছো। হেমাঙ্গিনী দাঁতে

দাঁত পিষে কথাগুলো বললো।

হেমাঙ্গিনীর কথায় হরনাথ হাসলো, সে এক বীভৎস হাসি।

হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠলো হরনাথ, তুমি ছলনাময়ী নারী, স্বামীর সঙ্গে চতুরী করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলে...

হেমাঙ্গিনী বলে উঠলো–সবের পিছনে ছিলো তোমার কুচক্র। তুমিই আমাকে অসৎ পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে শয়তান.....

শয়তান নামেই যখন আমাকে আখ্যায়িত করেছে হেমাঙ্গিনী তবে শয়তানের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না।

ছেড়ে দাও আমাকে......ছেড়ে দাও হরনাথ...

না, ছাড়বোনা। আমার কবল থেকে তুমি রক্ষা পাবে না হেমাঙ্গিনী। কথাটা বলে। হরনাথ টেনে নিয়ে ঝাপটে ধরলো হেমাঙ্গিনীকে।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি, হেমাঙ্গিনীর শরীরেও কম শক্তি ছিলোনা, সে একজন শক্তিশালী মহিলা। এক সময় সে অনেকগুলি পুরুষের নেতৃত্ব দিয়েছে। আজ সে মাতা, স্ত্রী, কোমল হৃদয় নারী তবুও তার দৈহিক শক্তি কমে যায়নি।

হরনাথ পশুর মত হামলা করলো হেমাঙ্গিনীর উপর।

হেমাঙ্গিনী মরিয়া হয়ে লড়ছে। নিকটে কোন অস্ত্র পেলে বসিয়ে দিত হরনাথের বুকে, কিন্তু সে এ মুহূর্তে অসহায়। তার কোন উপায় ছিলো না, সে নিজের দাঁত, নখ, ব্যবহার করলো, কামড়ে দিলো হরনাথের হাতের বাজুতে।

হেমাঙ্গিনীর দাঁত বসে গেলো হরনাথের বাজুতে।

ক্ষণিকের জন্য সে হেমাঙ্গিনীকে ছেড়ে দিলো আর সেই মুহূর্তে হেমাঙ্গিনী মুক্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। বাইরে কয়েকটি অশ্ব বাধা ছিলো, এগুলো হরনাথ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

হেমাঙ্গিনী একটি অশ্ব দ্রুত হস্তে খুলে নিলো এবং তার পিঠে চেপে বসলো। অশ্বচালনায় হেমাঙ্গিনী দক্ষ ছিলো। কাজেই অশ্ব পৃষ্ঠে চেপে সে দ্রুত পালানোর

চেষ্টা করলো।

উল্কা বেগে অশ্ব ছুটে চললো হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে।

অশ্বটা যেন অনুধাবন করেছে মহিলাটি বিপদগ্রস্ত। তাই সে প্রাণ পণে ছুটছে।

হরনাথ অত্যন্ত সুচতুর সে অপর একটি অশ্ব নিয়ে হেমাঙ্গিনীর পিছু ধাওয়া করলো।

হাওয়ার বেগে ছুটলো হরনাথ।

কিছুক্ষণ ধরে বন বাদার উঁচুনীচু পথ চলার পর হেমাঙ্গিনী আর এগুতে পারছে না, কারণ এ সব পথ তার সম্পূর্ণ অচেনা। এ জায়গাটার নামও সে জানে না। কোন দিন হেমাঙ্গিনী এ পথে আসেনি। সূর্যের তীব্র খর রৌদ্রে ঘেমে উঠে তার শরীর। হেমাঙ্গিনী ভাবতেও পারেনি হরনাথ তার সর্বনাশ করতে চাইবে। যে হরনাথকে সে একদিন সমীহ করতো, বিশ্বাস করতো সেই হরনাথ আজ তার কাছে হিংস্র ব্যাঘ্রের চেয়েও ভয়ংকর।

হরনাথের অশ্ব হেমাঙ্গিনীর অশ্বের পথ রোধ করে ফেললো এবং হেমাঙ্গিনীর অশ্বকে ধরে ফেললো হরনাথ। তারপর জোরপূর্বক তাকে নামিয়ে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিলো। হরনাথ হেমাঙ্গিনীকে নিয়ে ছুটলো নিজ আস্তানার দিকে।

দ্রুত অশ্ব চালনায় দক্ষ হরনাথ, কিছু সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেলো তার গন্তব্যস্থানে। হেমাঙ্গিনীকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিলো, তারপর সে তাকে নিয়ে গেলো গোপন আস্তানার চোরা কুঠরিতে।

ধস্তা ধস্তি শুরু উভয়ের মধ্যে।

মাটিতে শুইয়ে ফেললো হরনাথ হেমাঙ্গিনীকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার দরজায় এসে দাঁড়ালো জমকালো পোশাক পরিহিত একজন। দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার।

হরনাথ চমকে উঠলো।

হেমাঙ্গিনী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো–বনহুর তুমি! বাঁচাও বনহুর, আমাকে এই নর পশুর কবল থেকে বাঁচাও……

হরনাথ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভালভাবে তাকালো বনহুরের দিকে। তার দৃষ্টি বনহুরের হাতের রিভলভারে স্থির হলো। বললো হরনাথ-তুমিই বনহুর। হেমাঙ্গিনী প্রিয়জন তুমি……

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর হরনাথ তুমি হেমাঙ্গিনীর প্রিয় পাত্র সেজে তার সর্বনাশ করেছিলে। এবার আবার তার সব লুটে নিতে যাচ্ছিলে। পশুর চেয়ে অধম, শয়তান এবার মৃত্যু জন্য প্রস্তুত হও।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে হৃদপিন্ড কেঁপে উঠলেও সে দাঁতে দাঁত পিষে বললো– ওঃ তুমিই বনহুর–সর্বনেষে দস্যু, হাজার হাজার মানুষকে তুমি হত্যা করেছো…

বললো বনহুর–মানুষকে নয় তোমার মত হিংস্র জন্তুদের আমি হত্যা করেছি, তোমাকেও এখনি ওদের সঙ্গী করবো।

হরনাথ জানতো বনহুর অত্যন্ত ভয়ংকর, কাউকে হত্যা করতে তার বুক একটুও কাঁপেনা। ঐ হাতের রিভলভারখানা এই মুহূর্তে গর্জে উঠতে পারে। তার হাতে এখন কোন অস্ত্র নাই, সে জানতো না, তার এই গোপন আস্তানায় বনহুর কোনক্রমে প্রবেশ করতে পারবে। যমদুতের মত বনহুর তার সম্মুখে দন্ডায়মান। হরনাথ হেমাঙ্গিনীকে দ্রুত টেনে নিলো সামনে। হরনাথ জানে হেমাঙ্গিনীকে বনহুর হত্যা করবে না। আর সেই কারণেই হরনাথ হেমাঙ্গিনীকে সামনে চেপে ধরলো।

বনহুর এ কারণেই গুলি ছুঁড়তে পারলো না।

হরনাথ পিছু হটছে।

বনহুর দ্রুত সরে এলো, হরনাথকে পিছু হটার সুযোগ না দিয়ে, বাম হস্তে টেনে নিলো হরনাথকে, তারপর তলপেটে মারলো একটি প্রচন্ড লাথী।

হরনাথ পেট চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লো কক্ষটির মেঝেতে।

সে উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে হরনাথের মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, মুহর্তে মুখ থুবড়ে উবু হয়ে পড়ে গেলো। হরনাথের বুকের মাঝামাঝি গুলি বিদ্ধ হয়ে ছিলো। রক্তের স্রোত নেমে এলো।

লালে লাল হয়ে গেলো মেঝেটা।

হেমাঙ্গিনী হরনাথের প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে বললো, বনহুর তুমি ওকে উপযুক্ত সাজা দিলে। কেমন করে ঠিক সময় মত এসেছো? ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন। তার দয়ায় আমি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করতে পেরেছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই নাও বনহুর আমার হীরক অংগুরী, এটা আমার ইজ্জত রক্ষার উপহার।

বনহুর বললো–চল তোমাকে তোমার প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলো বনহুর। সত্যি তোমার উপকারের কথা কোন দিন ভুলবোনা।

হরনাথের কয়েকটি অশ্ব বাইরে ছিলো প্রয়োজন বোধে সে এই অশ্বগুলি ব্যবহার করতো। বনহুর আর হেমাঙ্গিনী দুটি অশ্বপৃষ্ঠে দু'জন চেপে বসলো।

দুটি অশ্ব ছুটে চললো উলকা বেগে।

হেমাঙ্গিনীর মনে আনন্দ উচ্ছ্বাস। হরনাথের মত নরপশুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে সে, বনহুর তার ইজ্জৎ রক্ষা করেছে, নইলে হেমাঙ্গিনী ও মুখ কোনদিন কাউকে দেখাতে পারতো না। হেমাঙ্গিনীর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, তবু তার জীবন পবিত্রময়। নারীর ইজ্জৎ সব চেয়ে বড় জিনিস। তাই সে আজ উচ্ছল আনন্দে ভরপুর। হরনাথ আর আসবেনা কোন দিন, তার সর্বনাশ সে করতে পারবে না।

বনহুর হেমাঙ্গিনীকে পৌঁছে দিলো তার প্রাসাদে। তারপর সে ফিরে এলো নিজ গুহায়। গুহার দেয়ালে মশালের আলো গুলো দপ দপ করে জ্বলছে।

আংগুল থেকে হেমাঙ্গিনীর দেওয়া হীরক আংটিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো গুহার বাইরে। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করলো সে দুহাত তুলে।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে, কুর্নিশ জানিয়ে একটি চিঠি বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের দিকে, রহমানের মুখে বিস্ময় বললো সে-সর্দার এ চিঠি পুলিশ প্রবীণের তরফ থেকে এসেছে,

বনহুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে মেলে ধরে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো–রহমান পুলিশ মহলের আমন্ত্রণ পত্র.....

অস্ফুট কণ্ঠে বললো রহমান–সর্দার।

হাঁ পুলিশ মহল আমাকে নিয়ে জোর তদন্ত চালিয়ে চলেছিলো তুমি নিশ্চয়ই জানো।

জানি সর্দার! একটু থেমে বললো রহমান–পুলিশমহল হন্তদন্ত হয়ে গবেষণা চালিয়ে আপনার......থেমে গেলো রহমান।

বনহুর বললো–হা তুমি যা ভাবছো তাই!

কান্দাই পুলিশ অফিসের সম্মুখস্থ মাঠে আজ জন সমুদ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে বহু লোক। তারা সবাই নিজ নিজ দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের পুলিশ কর্মকর্তাগণ। কান্দাই এর পুলিশ মহলের সকল কর্মকর্তা ছাড়াও এসেছেন সেনা অধিনায়কগণ।

সবাই নিজ নিজ পোশাকে সজ্জিত।

মঞ্চের সম্মুখস্থ সোফায় এবং চেয়ারে তারা উপবিষ্ট। অন্যান্য সবাই বিভিন্ন আসনে বসে উন্মুখ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন সম্মুখস্থ মঞ্চের দিকে।

সকলেই বাকহীন নিঃস্তব্ধ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সম্মুখে আসবে বিশ্বখ্যাত দস্যু বনহুর।

কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ রুশদী বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বস্থানে জানিয়ে দিয়েছে দস্যুরাজ বনহুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কান্দাই পুলিশ অফিসের সম্মুখস্থ বিরাট বিস্তৃত খোলা মাঠে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, তাকে

এক নজর দেখার বা জানার স্বাদ যাদের আছে তারা যেন উক্ত তারিখে কান্দাই উপস্থিত হয়ে উক্ত পুলিশ অফিস সম্মুখ মাঠে হাজির হন।

সংবাদটা শোনার পর হতেই পৃথিবীর সর্বস্থানের জনগণের মনে প্রবল বাসনা তারা বনহুরকে এক নজর দেখতে চায়। প্রবল বাসনা নিয়ে সবাই উক্ত তারিখের পূর্বেই রওয়ানা দেয় কান্দাই অভিমুখে। সত্যি কি তারা বনহুরকে দেখতে পাবে এটা কি সম্ভব।

আজ সেই উক্ত তারিখ, উনুখ দৃষ্টি নিয়ে সবাই প্রহর গুণছে।

মিঃ রুশদী মিঃ আহম্মদ এবং বিভিন্ন দেশের পুলিশ হর্তাকর্তা নিজ নিজ ড্রেসে সজ্জিত হয়ে মঞ্চে বসে আছেন।

পুলিশ মহলের সকলের কোমরের বেল্টে দেখা যাচ্ছে জমকালো রিভলভার।

বনহুরের গাড়ি এখনও এসে পৌঁছায় নাই।

কান্দাই পুলিশ সুপার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং জুন সমুদ্রকে লক্ষ্য করে বললেন-জানি আপনারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন যার জন্য সে এখনও এসে পৌঁছায় নাই, তাই আমি এই মুহূর্তে তার সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চাই!

সকলে একাগ্রচিত্তে তাকালেন কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ রুশদীর মুখের দিকে।

তিনি বলতে শুরু করলেন-হাঁ, এ কথা ঠিক, সত্য আর ন্যায়ের প্রতীক দস্যু বনহুর! আর্তমানবতার প্রতীক সে। এই পৃথিবীর সর্বস্থানে তার আগমন ছিলো বা আছে। যেখানেই সে দেখেছে অন্যায় অনাচার সেখানেই সে সচ্ছন্দে প্রবেশ করেছে, অন্যায় অনাচারকে সে সমূলে ধ্বংস করেছে এক কথায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলো তার সংগ্রাম! হাঁ সে জয়ী হয়েছে.....

থামলেন মিঃ রুশদী তাকে অত্যন্ত দীপ্ত প্রফুল্ল মনে হচ্ছিলো পুনরায় বলতে শুরু করলেন-বনহুর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকের শত্রু হতে হয়েছে এ কথা সত্য! এক শ্রেণীর মানুষ তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আর এক শ্রেণীর মানুষের সে অভিশাপ। আমরা পুলিশ মহল তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সদা সর্বদা অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত ছিলাম। এমন কি লক্ষ লক্ষ টাকা তার বিনিময়ে ঘোষণা

দিয়েছিলাম। হাঁ তাকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছিলো কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারাগার হাঙ্গেরীও তাকে আটকে রাখতে পারেনি। বনহুরকে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুলিশ মহলে এবং গোয়েন্দা বিভাগে নানা ভাবে তদন্ত চালানো হয়। সুদীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নানা ভাবে বনহুর কে নিয়ে গবেষণা চলে! নানা ভাবে তদন্ত এবং গবেষণা মাধ্যমে যা ডায়রীতে লিপিবদ্ধ হয় তাতে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। যা সে করেছে বা করছে তা মানুষের মঙ্গলের জন্য করেছে! দস্যুতা তার জীবনে এনে দিয়েছে সফলতা! অসৎ উপায়ে যারা অর্থ উপার্জন করে ধনকুবেরু হয়েছে, যারা অসহায় মানুষের রক্ত শোষণ করে নিজেদের ঐশ্বর্যের ইমার গড়ে তুলেছে তাদেরকে সায়েস্তা করতে গিয়ে বনহুরকে হতে হয়েছে নির্মম, হত্যা করতে হয়েছে অসংখ্য মানুষ নামি জানোয়ারগুলোকে! এই জানোয়ার সম মানুষগুলো তাদের কৃত কর্মের জন্য আইনের কাছে তারা অপরাধী এবং বিচারে তাদের মৃত্যুদন্ড হতো, হয় ফাঁসী নয় ফায়ারিং। বনহুর এদের হত্যা না করলে দেশের সত্যিকারের মানুষগুলো তিলতিল করে নিঃশেষ হয়ে যেতো! এক ধরনের মানুষ অর্থের লোভে দেশের যুব সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছে অর্থের মোহে! বনহুর কিছুদিন পূর্বে হিরোইন প্রস্তুত কারকদের সমূলে ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করেছে তাদের হিরোইন প্রস্তুতকারী চোরা ঘাঁটিগুলো। বহু অন্যায় কে সে প্রতিহত করেছে......বনহুর সম্বন্ধে গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ এসব তদন্তের মাধ্যমে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে! হাঁ আপনারা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন। আমি কান্দাই আসার পর বনহুরকে দেখার যথেষ্ট ইচ্ছা পোষণ করেছি এবং এ কারণেই আজকের এই সমাবেশ। অনেক সুন্দরী তরুণীই তাকে ভালবাসে কিন্তু বনহুর অভূতপূর্ব চরিত্রবান, সে কোন নারী বা তরুণীকে গ্রহণ করেনি! নারীকে সে অনেক বেশি সম্মান দিয়ে থাকে......বহু উদাহরণ আছে বনহুরকে নিয়ে।

এমন সময় আকাশি রং এর একখানা গাড়ি এসে থামলো পুলিশ অফিসের জনসমুদ্রের পাশে।

সকলের দৃষ্টি পড়লো গাড়ি খানার দিকে। ড্রাইভ আসন থেকে ড্রাইভার নেমে গাড়ির পিছন দরজা খুলে ধরলো।

সবাই বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে গাড়ি খানার দিকে এই গাড়ি খানাই কি দস্যু বনহুরের। সকলের মনে একই প্রশ্ন। দূর দূরান্ত থেকে তাদের আকাংক্ষিত দস্যু বনহুরকে একবার স্বচক্ষে দেখার জন্য চাতকীর মত তাকিয়ে ছিলো তারা।

মিঃ রুশদী এবং পুলিশ সুপার মিঃ আহমেদ মঞ্চ থেকে নেমে এলেন গাড়ির পাশে, বনহুর মিঃ রুশদী ও মিঃ আহম্মদের সঙ্গে করমর্দন করলো। পুলিশ সুপারদ্বয় দস্যু বনহুরকে নিয়ে এলেন মঞ্চে।

বনহুরের দেহে আজ জম কালো ড্রেস নাই। আজ তার দেহে শোভা বর্ধন করছে সাদা ধপধপে পা-জামা, পাঞ্জাবী। এই পোশাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে। পৌরুষদীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা মুখমন্ডল অদ্ভূতপূর্ব সুন্দর মুখে মিষ্টি হাসির আভাস।

বনহুর মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই পুলিশ সুপার মিঃ রুশদী হাস্যোজ্বল মুখে বললেন– এই সেই আপনাদের আকাঙ্খিত দস্যু বনহুর।

উপস্থিত সকলেই বাকরুদ্ধ ভাবে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে চোখে মুখে তাদের বিস্ময়। মিঃ রুশদী বললেন, জানি আজ আপনারা আপনাদের আকখিত দস্যু বনহুরকে দেখে তৃপ্ত।

দর্শকদের মধ্য হতে একজন বললেন-শুধু তৃপ্তই নয়, আজ আমরা ধন্য। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক দস্যু বনহুর, আত্ম-মানবতার প্রতীক, আমরা সকলেই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মিঃ রুশদী পুলিশ প্রধান মিঃ খানের হাতে মালাটা তুলে দিয়ে বললেন-মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী বনহুরকে মাল্য ভূষিত করছেন আমাদের পুলিশ প্রধান মিঃ খান!

মিঃ খান হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন–বনহুর তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই। লক্ষ লক্ষ টাকার হীরক মালা পরিয়ে দিলেও জানি তুমি খুশি হবে না, তাই আল্লাহর মহা মূল্যবান এই ফুলের মালা খানা আমাদের ভালবাসার সম্পদ স্বরূপ তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম।

গোলাপের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো–আমি আপনাদিগকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনাদের ভালবাসা আর আল্লাহর রহমত আমাকে জয়যুক্ত করেছে। আজ আমি ধন্য। একটু থেমে বললো বনহুর– আজ আমাকে আপনারা যে সম্বোধন জানালেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বনহুরের পৌরুষ দীপ্ত

সুন্দর মুখখানা অপূর্ব লাগছিলো। সবাই তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। সবার কাছে দস্যু বনহুর ছিলো আতঙ্ক, সেই দস্যু বনহুর এতো সুন্দর।

[সমাপ্ত]

পূর্ববর্তী:

« ৮.১৭ শত্রুর কবলে নূর